শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা

(জীবনী ও উপদেশ)

3/201

৪/১০ ২

শ্রীতরুবালা দেবী

(সন্ন্যাসিনী)

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 3/201

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা

(জীবনী ও উপদেশ)

3/201
৪/১০৬

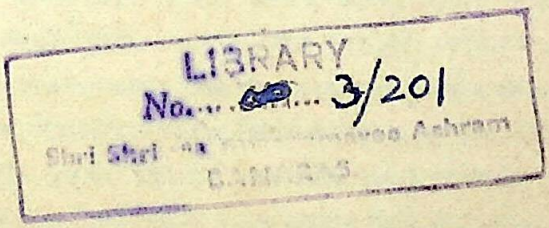

শ্রীতরুবালা দেবী
(সন্ন্যাসিনী)

শ্রীসিদ্ধিমাতা আশ্রম
১২০, হড়র বাগ,
কাশীধাম

প্রকাশিকা—শ্রীতরুবালা দেবী
(সন্ন্যাসিনী)
শ্রীসিদ্ধিমাতা আশ্রম
১২০, হরড় বাগ,
কাশীধাম

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দে
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
কলিকাতা—১৩

ভূমিকা

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার জীবনকালে কোন কোন ভক্ত তাঁহার জীবনী প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, মা তাহাতে রাজী হন নাই। কিন্তু মায়ের অন্তিম সময়ে কৃপা করিয়া তিনি একজন শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "তোমরা নিজেদের কল্যাণ বোধ করিলে আমার জীবনী প্রকাশ করিতে পার।" তাহাতে শিষ্যটি বলিল, "আপনি নিজে দিব্যরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রকাশ করিলে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে।" মা মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দেহরক্ষা করার পরেই মায়ের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্তা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা তরুবালা দেবী মায়ের একজন প্রিয়শিষ্য সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহারা মায়ের নিকট প্রার্থনা করেন যাহাতে তিনি কৃপা করিয়া নিজের সাধন জীবনের ক্রম বিকাশ ও রহস্য প্রকাশ করেন। তরুদিদির মধ্যে মায়ের আবেশ অনেক সময় হইত এবং অনেক আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ হইত, কখনও গদ্যে ও অনেক সময় পদ্যে। মায়ের দেহ থাকিতেই এইরূপ হইত। প্রার্থনানুযায়ী শ্রীবৃন্দাবনে মায়ের সাধন, সিদ্ধ জীবন ও উপদেশ প্রকাশ হইতে লাগিল। তরুদিদি এই উদ্দেশ্যে যখনই বসিতেন তখনই আবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে নানা বাণী প্রকাশ হইত এবং শিষ্যটি তাহা লিখিয়া লইতেন। এইরূপে বৃন্দাবনে ও হৃষিকেশে যাহা স্ফুরিত হইয়াছিল গ্রন্থাকারে "শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা" নামে প্রকাশিত হইল। আমরা মায়ের মুখে নিজের সাধন ও সিদ্ধি সম্বন্ধে যে সব অদ্ভুত কথা শুনিয়াছিলাম সে সব অনেক কথা এই গ্রন্থে আছে, বুদ্ধি ও বিচার নিয়া এই পুস্তক লেখা হয় নাই। এক এক সময় এক একটী ভাব বা প্রশ্ন নিয়া নানা ঘটনা বা সাধনের কথা বাহির হইয়াছে, সেগুলি পরে ক্রমবদ্ধ করিয়া সাজান হইয়াছে, এই সাজান ব্যাপারটীই বুদ্ধির কাজ। বাকী সব স্বাভাবিক স্ফুরণ, তবে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না করার জন্য কোন কোন স্থলে পদ্যে প্রকাশিত বর্ণনা গদ্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাও মায়ের

আদেশে। এই গ্রন্থে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তাহা প্রার্থনা ও প্রশ্নের ফলে। মায়ের জীবনের কোন কথা বা তত্ত্ব যদি বাদ গিয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে প্রশ্ন বা প্রার্থনা ঠিক হয় নাই।

মায়ের পুণ্য দর্শন লাভ করি কয়েকবার মাত্র, তাহাও দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্ব্বে। বহুদিন দার্শনিক আলোচনা করিয়া ও বড় বড় সাধু ও পণ্ডিতদের সংশ্রবে আসিয়া জীবনের গভীর রহস্য সম্বন্ধে এমন কোন পূর্ণদৃষ্টি লাভ করিতে পারি নাই যাহাতে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদের মতবাদের মধ্যে একটী দার্শনিক সমন্বয়ের সৃষ্টি হয়। সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে নানা পথে সাধনদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া দেখাইয়াছেন, 'যত মত তত পথ', রাস্তা পৃথক হইলেও গন্তব্য স্থল এক। ব্রহ্ম ও কালী এক, নিত্য ও লীলা একই সত্বার দুই দিক মাত্র। জ্ঞানে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, কিন্তু বিজ্ঞানে ব্রহ্মই জীবজগৎ হইয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিয়া দেখা গেল, ছাদ যে জিনিষের সিঁড়িও সেই জিনিষের। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ। এই তত্ত্বটীই স্তরে স্তরে দার্শনিক দৃষ্টিতে বুঝিলাম মায়ের সংস্পর্শে আসিয়া।

মা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ ছিল না, জীবনের অধিকাংশ কাল অবগুণ্ঠিতা ছিলেন, কাহারও সঙ্গে মিলামিশার অবসর খুব অল্পই পাইয়াছিলেন। কঠোর সাধনা ও ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় তিনি যে সব দিব্যদর্শন ও অনুভূতির অধিকারিণী হইয়াছিলেন সে সব অপূর্ব্ব ও অচিন্ত্য জ্ঞান পূর্ণ। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে যে সব তত্ত্ব নিহিত আছে এবং যাহাদের সঙ্গে পরিচিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন ধার্ম্মিক ও দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোন বিবাদ বা অমিল দেখা যায় না সে সব এই গ্রন্থে মায়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়াছে।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, মানব দেহে তাহার সবই বিদ্যমান। ভগবৎ কৃপায় ও সাধন বলে চিৎশক্তি বা কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত নানা প্রকার দিব্যদর্শন ও অনুভব হয় এবং জীবন জড়সম্বন্ধ ত্যাগ

করিয়া ক্রমে চৈতন্য সত্তায় রূপায়িত হয়। শক্তির জাগরণ নাভিতে হয়, তখন ভিতরের পথ খুলিয়া যায়। তখন কেহ দেখেন সর্প কেহ দেখেন মাতৃমূর্ত্তি। সেই শক্তি সাধককে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠেন। হৃদয়ে অনাহতে দ্বাদশ দল বা অষ্ট দল, সেখানে নারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণ, ভক্তের বৃন্দাবন, এই স্তরে নির্গুণ ভাবে আত্মদর্শন হয়, অন্তঃসূর্যের প্রকাশ হয়। আত্মদর্শন না হইলে কোন অনুভবই ঠিক হয় না, নিজেকে না জানিলে সব জানাতেই ভুল থাকার সম্ভাবনা। নিজের স্বরূপ জানিলেই মহাকৃপা বলে আমি তুমি ভাব ফুটিয়া উঠে। তার উপর কণ্ঠে বিশুদ্ধ, ষোড়শদল শিব শুইয়া আছেন, জ্ঞান পথে। তিনি জাগিলে ভ্রুযুগলের মধ্যে দ্বিদল আজ্ঞাচক্রের দর্শন হয়, জ্ঞানভূমি কাশী সেখানে জাগ্রত শিব, এই স্তরে সাধকের তৃতীয় নেত্র খুলিয়া যায় ও সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হয়। জ্ঞানের প্রতীক ওঁকার দর্শন হয়। এখানে শিব শক্তির মিলন আরম্ভ হয়। অঙ্গে অঙ্গে মিলন, বহু দুই-এ এবং দুই একে পরিণত হইয়া মহামিলনের দিকে গতি, মিলমিশ্রণ, এবং অবশেষে মস্তকে সহস্রারে সহস্র দলে শিব শক্তি পূর্ণভাবে মিলিত হন, অর্দ্ধনারীশ্বর দর্শন হয়। সাধকেরও পৃথক সত্তা থাকে না। কখনও শিবের সঙ্গে, কখনও শক্তির সঙ্গে, কখনও মিলিত শিব-শক্তির সঙ্গে মিলিয়া এক হইয়া যান। অদ্ভুত লীলা আরম্ভ হয়। ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সপ্ত লোক এই সাতটী চক্রে আছে, তাহার উপর ব্রহ্মলোক, শিবলোক (কৈলাস) ও বিষ্ণুলোক (বৈকুণ্ঠ) এই পর্য্যন্ত সব লৌকিক। তার উপর লোকাতীত শূন্য ও মহাশূন্য। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা উচিত যে যেমন উক্ত লৌকিক দর্শন সকলের পরে শূন্য ও মহাশূন্য ভাব দেখা যায় তেমনি ঐসব দর্শনের পূর্ব্বেও আছে, কারণ চিদাকাশ এবং শূন্য ও মহাশূন্য পথ না খুলিলে কোন সত্য দর্শনই হয় না। কিন্তু যাহা লোকাতীত তাহাকেই প্রকৃত শূন্য ও মহাশূন্য বলিলে কোন দোষ হইবে না। এইস্তরে যাবতীয় লোকের ও স্থূল প্রকৃতির একান্ত অভাব—বিরাট নাস্তি। শূন্যে নীল জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার আকাশ। এখানে দেহ জ্ঞান লোপ পায়, মন প্রাণ স্তব্ধ হয়।

এর উপর মহাশূন্য, শুধু সম্বিৎ বা চৈতন্য, শ্বেত জ্যোতির্ম্ময় আকাশ, একটী ওঁকার ও অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ নারায়ণ একা। তাহার উপর ব্রহ্মপদ। এইখানে চতুর্ভুজ নারায়ণ সদ্‌গুরুরূপে ব্রহ্মমন্ত্র দেন। বাহ্যজ্ঞান থাকে না। তখন সর্ব্বভূতে নারায়ণ বা ব্রহ্ম দর্শন হয়। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের স্বরূপ নারায়ণ, তিনি পরম ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর। তিনিই সাধককে নানা ঈপ্সিত দিব্যরূপে দর্শন দেন বা নিজের সঙ্গে এক করিয়া নেন। ভক্ত ও ভগবান বা জ্ঞানী ও জ্ঞান সমান সমান। এই পদে প্রতিষ্ঠা হইলে ব্রহ্মস্থিতি হয়, অনন্ত মহাকাশে অন্তহীন জ্যোতির ছড়াছড়ি। ব্রহ্মের প্রতীক ওঁকার ব্রহ্মসমুদ্রে ডুবিতেছে ও ভাসিতেছে। এই অবস্থায় সাধকের দুইটী ভাব হইতে পারে :—আমি—আমি ও তুমি—তুমি। শুদ্ধ জ্ঞান নিয়া থাকিলে আমি—আমি ভাব, সোঽহম্; আমিই সব। শুদ্ধপ্রেম নিয়া মধুর ভাবে থাকিলে তুমি—তুমি ভাব। এই অবস্থায় মহাকৈলাস বা গোলোকে নিত্যলীলা দর্শন হয়। মহাকৈলাসে মহাশিব স্বগণসহ আত্মসমাহিত এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা ও গোপগোপীদের সঙ্গে লীলাপরায়ণ। এই ভাব তীব্র ও বিশুদ্ধ হইলে পরম পদ প্রাপ্তি, পরম পদ. পরম ধাম—কঠোপনিষদে যেমন—"সোঽধ্বনি পরমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণুঃ পরমং পদং" শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ১৫ অধ্যায়ে পরম পদের প্রকার ও প্রাপ্তির উপায় :—

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্ত্বা। ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ। তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ নির্ম্মানমোহাজিতসঙ্গদোষা, অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ন তদ্ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরমব্রহ্ম ভগবানের শ্রীচরণে স্থান হয়। অনাদি অনন্ত জ্যোতিজাল অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় শ্বেতবর্ণ মহাবিষ্ণুর পাদনখ কণা হইতে

সদা বিচ্ছুরিত হইতেছে। পরম কৃপাবলে এই অবস্থার দর্শন ও প্রাপ্তি হয়। বিশুদ্ধ তুমি—তুমি ভাব, অর্থাৎ সমস্ত ভাবের লয়। তুমি বা এক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু বা কেহ নাই। চতুর ভক্ত এই পদটী আকাঙ্ক্ষা করেন, এখানে আমি নাই, শুধু তুমিই। ইহাই পরম ব্রহ্মপদ। এই অন্তিম স্তরে সাধকের ভৌতিক দেহ ব্রহ্মাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সিদ্ধ দেহে বা ব্রহ্মদেহে পরিণত হয়, তবে লীলার জন্য ভক্ত একটী মধুর গণ্ডি টানিয়া রাখেন। ব্রহ্মপদে ভক্ত ও ভগবান মিলিয়া এক হইয়া যায়, এই এক হওয়ার ধারা পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয় মিল মিশ্রণের স্তরে। সেখানে সত্ত্বা একই ; একভাবে আমি, অন্যভাবে তুমি অহং, ত্বং, সঃ একই তত্ত্বের সর্ব্বনাম। একই অনির্ব্বচনীয় বস্তুর নামান্তর মাত্র। এই অবস্থায় জীব তাহার নাম ও রূপ হারাইয়া নিজের স্বরূপ ও স্বভাব লাভ করে পরম ব্রহ্মে। লৌকিক রূপের একান্ত অভাব হয়, কিন্তু অলৌকিক চিন্ময় রূপের বিকাশ হয়। জীবের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব পূর্ণরূপ ফুটিয়া উঠে, মুক্তির দিক দিয়া সারূপ্য ও শেষে সাযুজ্য প্রাপ্তি এবং লীলার দিক দিয়া মাধুর্য্যে স্থিতি হয় কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিসত্ত্বা লোপ পায় না, এক বিরাট আধ্যাত্মিক সত্ত্বার বিকাশ হয়। ব্রহ্মসূত্রের "সৃষ্টি ব্যাপার বর্জং" সূত্রানুসারে মুক্ত পুরুষগণ সৃষ্টি স্থিতি লয় ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় ঐশী শক্তির অধিকারী হন এবং "সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ" সূত্র অনুসারে তাঁহারা ব্রহ্মলীন হইয়া আবার জাগিয়া উঠেন এবং নিজ নিজ স্বরূপ প্রাপ্ত হন। এই হেতু সূক্ষ্মে মুক্ত পুরুষদের দর্শনাদি সম্ভবপর হয়। এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে জ্ঞান ও প্রেমের পথ ভিন্ন হইলেও গন্তব্যস্থল একই—ব্রহ্মপদ বা পরমপদ। যাঁহারা বিচার ও জ্ঞানমার্গী তাঁহারা পরে প্রেম পাবেন, কারণ বিচার ও জ্ঞান দ্বারা যে তত্ত্ব স্থির হইয়াছে শেষে তাহাতে রমণ করিবেন, আর যাঁহারা প্রেম ও বিশ্বাস মার্গী তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই তত্ত্ব জানিবেন। অন্তিম গতি ও স্থিতি উভয়েরই এক, তবে যাহারা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী অথচ প্রেমী যেমন নারদ, শুকদেব প্রভৃতি তাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তাঁহারা ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র।

পরম পদে জীবাত্মাও পরমাত্মার মহামিলনে জ্ঞান ও প্রেমের অভূতপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হয়। "জীবের অন্তিম অবস্থা পরমপদ লাভের উপায় ভগবানকে একমাত্র সত্য জানিয়া তাঁহাকে পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন। একদিকে ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিচার, বিবেক, রূপধ্যান, প্রার্থনা ও তীব্র ব্যাকুলতা, অন্যদিকে পরম পুরুষের এবং তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি সদ্‌গুরুর পরমকৃপা। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া জীব কিছু দূর অগ্রসর হইতে পারে, বড় জোর ইন্দ্রিয় সংযম ও চিত্তশুদ্ধি, বাকী সব কৃপাসাপেক্ষ"। (কায়া ভেদী বাণী ৬৭)।

অন্তিম সত্তা এক কি একাধিক এই প্রশ্ন চিন্তা জগতে বারবার উঠিয়াছে ও উঠিবে। দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীদের দৃষ্টিকোন্ সম্পূর্ণ পৃথক। চিৎ, অচিৎ, ব্রহ্ম বা জীব, জগৎ ও ঈশ্বর পৃথক কি এক এবং পৃথক হইলে তাহাদের পরস্পর কি সম্বন্ধ এই সব জটিল প্রশ্ন দার্শনিক জগতে নানা প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছে, কোন স্থির মীমাংসা হয় নাই এবং শুধু চিন্তা দ্বারা কোন মীমাংসা হইবেও না। প্রকৃত সাধন বলে প্রজ্ঞাচক্ষু খুলিলে সব সংশয়ের ছেদন হয় এবং নানা বিরুদ্ধবাদের মধ্যে এক অভিনব সামঞ্জস্য আত্মপ্রকাশ করে। কোন বস্তু দেখার জন্য সূর্য্য, চক্ষু এবং ইথর বা তড়িত-প্রবাহের প্রয়োজন। এই তিন বস্তুর পশ্চাতে একই আলো বা জ্যোতি বর্ত্তমান। এক হিসাবে দৃষ্টির একমাত্র কারণ জ্যোতি, অন্য হিসাবে সূর্য্য, চক্ষু ও ইথর তিনটাই কারণ। বিষয়টী নির্ভর করে ব্যক্তিগত অবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর। একই নদীতে বরফ ও বুদ্‌বুদ্ ভাসে, এক হিসাবে সবই এক জল, অন্য হিসাবে তিনটিই পৃথক। এইরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ও অদ্বয় তত্ত্ব। চিৎ অচিৎ ইহারই গুণ বা শক্তি দ্বয়। এক স্তরে যেটি নিরাকার নির্গুণ অন্য স্তরে সেটিই সাকার ও সগুণ। চিৎসত্তাই লীলার জন্য চিদ্‌রূপ ধারণ করে। শক্তি ও শক্তিমান পারমার্থিক দৃষ্টিতে অভেদ, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ভেদ ভাবাপন্ন। সাধনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শিব, শক্তি ও নিজের ভেদ, ভেদাভেদ ও অভেদের অনুভব হইলে বিষয়টী পরিষ্কার হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

এই গ্রন্থপাঠে অনেক গূঢ় রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে, আমার পূর্ণ বিশ্বাস।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamoyee Ashram
BANARAS.

3/201
৭/১৪

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা

(আত্মকথা ও উপদেশ)

মঙ্গলাচরণ

বন্দি গজানন বিঘ্ন বিনাশন
লম্বোদর স্থূল কায়।
গৌরীর নন্দন সিদ্ধির কারণ
বন্দি সদা তব পায়॥
মরাল বাহন শ্বেত পরিধান
বন্দি মাতা বীণাপাণি।
বন্দি পঞ্চানন জ্ঞান উদ্‌ঘাটন
সদাশিব মহাজ্ঞানী॥
বিধি দয়ানিধি বন্দি নিরবধি
সনাতন জনার্দ্দন।
ব্রহ্ম দেব ঋষি সদাই উদাসী
ভক্তি দাও সর্ব্বজন॥
দেব দ্বিজ গণে পঞ্চদেব জনে
প্রণমি অতি যতনে।

ইষ্টের চরণে বন্দি সর্ব্বক্ষণে
কৃপা রেখ নিজগুণে ॥
হর গৌরী মায় বিশ্বনাথ পায়
নতি করি অনুক্ষণ ।
গুরু নারায়ণ লহ, ব্রহ্মধন
পদে সভক্তি বন্দন ॥
ব্রহ্মময়ী সিদ্ধিমাতা গুরু শিক্ষা দীক্ষা দাতা
মুক্ত কর তুমি নারায়ণী ।
সংসারসারাৎসার জ্ঞান গঙ্গা হও আমার
সর্ব্বরূপে তুমি কাত্যায়নী ॥
চণ্ডাসুর বধ তরে অসি তুমি করে ধরে
কাম ক্রোধ লোভ আদি করি ।
নাশও মা তুমি কৃপায় ভক্তি দাও সদা আমায়
রাধা রূপে তুমি মহেশ্বরী ॥
ত্রিনয়নী তারা মাতা ত্রিতাপ হরো গো হেথা
হৃদয়েতে কর বাসস্থান ।
তব কৃপা বশ হয়ে তোমার করুণালয়ে
যেন মাতা থাকি সর্ব্বক্ষণ ॥
সাধনে বিজয় মাতা করাইবে যে সর্ব্বদা
খুলিয়া বিজ্ঞান ত্রিনয়ন ।
প্রণমি তোমার পায় অজ্ঞান না দিবে কায়
এই মোর সদা আকিঞ্চন ॥

গুরু জ্ঞান সদা ধরি তোমার সেবন করি
স্থির হ'ক মূঢ় মন মোর।
আত্ম উপদেশ বাণী প্রকাশ করো জীবনী
পুস্তক আকারে মাতা, তোর॥
সদ্‌গুরু রূপ ধরি ভবতারিণী শঙ্করী
তুমি রও হৃদয়ে স্থাপন।
ভক্তি প্রেমে মজে মন বক্ষেতে করি ধারণ—
—ব্রহ্ম পদ পতিত পাবন॥
বিনাশিলে ভব ভয় পার করিলে নিশ্চয়
তুমি ছাড়া মোর কেহ নাই।
অজ্ঞান তিমির জালে ফেল না মা কোন কালে
এই ভিক্ষা চাই তব ঠাঁই॥

* * * *

LIBRARY
No.....

মায়ের লৌকিক পরিচয়

(১)

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার লৌকিক পরিচয় সম্বন্ধে যে সব সংবাদ বিশ্বস্তসূত্রে পাওয়া গিয়াছে এবং যে কয়েকটি ঘটনা আত্মকথায় প্রকাশ হয় নাই অথচ সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে, সে সব অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা গেল। এই জীবনে লৌকিক ও অলৌকিক একসঙ্গে গাঁথা।

যশোহর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর নিবাসী ৺বরদাকান্ত চট্টোপাধ্যায় পিতা, মাতা শ্যামাসুন্দরী দেবী, জন্মস্থান মাতুলালয়ে, নৈলা, জামালপুর। মায়ের আবির্ভাব কাল শ্রাবণ শুক্লাষ্টমী, মঙ্গলবার, সম্ভবতঃ ১২৯৫ বঙ্গাব্দ। নাম কাত্যায়নী দেবী। পতি যশোহর জেলার ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, কৃষ্ণলোচন মুখোপাধ্যায়। আন্দাজ ১২।১৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। মাতা, পিতা, স্বামী ও শাশুড়ী সহ কাশী আসেন এবং সকলে পরপর কাশীপ্রাপ্ত হন। ১৫ই আষাঢ়, শুক্রবার, শুক্লাদ্বাদশী, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে পতি বিয়োগ হয়। মায়ের তিরোভাব কাল ১২ই বৈশাখ, সোমবার, কৃষ্ণাসপ্তমী, অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ। ইংরেজি সন ২৬শে এপ্রিল, ১৯৪৩।

মা যেদিন কুলগুরুর নিকট দীক্ষা নিয়াছিলেন সেই রাত্রে আসনে বসিয়া দেখিলেন যে, বীজমন্ত্রগুলি তাঁহার হৃদ্‌পটে বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত হইয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

গুরুর নিকট এই কথা বলিলে তিনি বারণ করিলেন অন্য লোকের কাছে তাহা প্রকাশ করিতে।

একদিন তাম্রথালায় মাটীর শিব গড়িয়া পূজায় ও ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় একটী সাপ আসিয়া ঐ থালাকে বেষ্টন করিয়া বসিল। সে দৃশ্য দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা ভয়ে চিৎকার করিতে লাগিল, তখন সাপটী পলাইয়া গেল।

বাল্যকাল হইতে মায়ের সর্ব্বদা অন্তর্মুখী দৃষ্টি ছিল। সাংসারিক কাজকর্ম্মে ও নিজের শরীরের দিকে চিরদিন উপেক্ষার ভাব ছিল। শ্বশুরালয়ে তাঁহার এই ভাব না বুঝিয়া লোকেরা তাঁহাকে অপরিষ্কার ও কুঁড়ে মনে করিত।

কাশীতে প্রথম সাধন কালে মা ধ্যানে ও ঠাকুর দর্শনে এত মগ্ন হইয়া যাইতেন যে অনেক সময় কপাট ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে বাহির করিতে হইয়াছে। ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ এই তিন বৎসর মায়ের লীলাদর্শন চলিয়াছে।

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে মায়ের কাছে বাণী হয়, "সাধনার পরিসমাপ্তি"। প্রথমে মা ইহা কানে শুনিলেন, বিশ্বাস করেন নাই। পরে যখন কায়ায় প্রকাশিত হইল, তখন বিশ্বাস করিলেন।

পতি বিয়োগের কিছুদিন আগে তিনি মায়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, "তুমি ত পার হয়ে গেলে, আমার কি হবে?" মা তখন আসনে বসিয়াছিলেন, ঠাকুর বলিলেন, "সেত আমার হইয়া গিয়াছে।" মায়ের মুখে এইকথা শুনিয়া তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করেন। * * * অন্তিম দিনে দেখা গেল ঘোর

অন্ধকার রাত্রিতে মস্তবড় একটী চাঁদ উঠিয়াছে। পরে মা দেখিলেন যে নারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন, চাঁদ তাঁহার কপালের জ্যোতি। শেষ রাত্রি ৪টায় অন্তিম কাল। ঠাকুরের সঙ্গে তিনি জ্যোতিরূপে মিশিয়া গেলেন।

একদিকে মায়ের জীবনে যেরূপ কঠোর তপস্যা ও অপূর্ব্ব তন্ময়তা, অন্যদিকে অসাধারণ ত্যাগ ও তীব্র বৈরাগ্য দৃষ্টিগোচর হয়। ২।১টি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া গেল।

শেষ দশ বৎসর মা যে বাড়ীতে থাকিতেন, সেইটি তাঁহার গুরুমায়ের বাড়ী। গুরুমা শেষ সময় মাকে জিজ্ঞাসা করেন মায়ের নামে বাড়ীটা লিখিয়া নিতে। মা উত্তর করিলেন, "আমার ঠাকুরই সর্ব্বস্ব। ঠাকুরের পাদপদ্মই আমার বাড়ী ঘর, আমি আর কিছুই চাই না। বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি দিয়ে আমার কি হবে?" মায়ের এইরূপ উপেক্ষাভাব দেখিয়া তাঁহার গুরুমা বাড়ীটি নিজ বোনপোর নামে লিখিয়া গেলেন। কেবল এই সর্ত্ত রহিল যে, মা যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন সেখানে থাকিতে পারিবেন।

মায়ের নিকট অনেকে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে একটি পৃথক আশ্রম করার অনুমতির জন্য। গোবর্দ্ধন মহাশয় মায়ের একজন ধনী গুজরাটী ভক্ত, তিনি মায়ের জন্য একটি পৃথক বাড়ী ও আশ্রম করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মা বলিলেন 'আমি এই বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।' তিনি এইসব করিতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

মায়ের জীবদ্দশায় গোবর্দ্ধন মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মায়ের জীবনী প্রকাশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মা তাহাতে রাজী হন নাই। পরে শেষ সময় এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন দুইটি কাজ করিতে।

১। তোমরা আমার জীবনী লিখিবে যদি তাহাতে নিজেদের মঙ্গল মনে কর। ইহা শুনিয়া শিষ্যটি বলিয়াছিল, "যদি আপনি দিব্যভাবে আবির্ভূতা হইয়া নিজের জীবনী আমার নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি লিখিব, নতুবা লিখিব না।" ভগবানের ইচ্ছায় তাহাই হইল।

২। চেষ্টা করিবে যাহাতে এই সাধন স্থান এইভাবে থাকে, ইহাও তোমাদের মঙ্গলের জন্য বলিতেছি। আমার নিজের কোন অনিচ্ছা নাই। বাড়ীঘর জিনিষপত্র সম্বন্ধে এই বাণী প্রকাশ হইয়াছে, মায়ের সব সময় ব্রহ্মলীন অবস্থা।

উপেক্ষা করিত সদা আমার জননী,
নিজভাবে ভাবুক হয়ে থাকিতেন তিনি।
নাহি থাকিত মায়ের বাহিরের জ্ঞান,
স্থূলের বিচার কভু না করেন বিধান।
বাড়ীঘর নাহি মনে সদাই উদাস,
ভগবান নিয়া সদা করেন উল্লাস।
সকলে বলিতাম মোরা আশ্রম লাগিয়া,
তাহাতে দিতেন এই উত্তর বলিয়া।

কিসের আশ্রম বাপু কিছু নাহি জানি,
এক আশ্রম ভগবান তাহা আমি জানি।
বাহিরের আড়ম্বরে কিবা প্রয়োজন,
তোমাদের ইচ্ছা হ'লে করিবে আশ্রম।
ঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে,
আমার আশ্রম বলি কিছু না রহিবে।
আমাদের মায়ের ছিলেন গুরুমাতা,
মাকে বলিয়াছিলেন আশ্রমের কথা।
মা বলিল আশ্রমে আমার কিবা কাজ?
সর্ব্বদা যে আছি আমি ঠাকুর সমাজ।
আমাদের মাতা যদি মনেতে করিত,
আশ্রম তাঁহার নামে তখনি হইত।
সিদ্ধিমাতার উপেক্ষায় আশ্রম না হ'ল,
তথাপি মায়ের গুরু লিখনি লিখিল।
যতদিন জীবিত থাকিবে মায়ের কায়া,
বসবাস করিবেন তিনি কৃষ্ণজায়া।
উপেক্ষা ছিল যে সদা মায়ের অন্তরে,
আসনের ব্যবস্থা না কহিল কাহারে।
কিবা আছে কি হইবে কিছু নাহি মনে,
ব্রহ্মভাবে মগ্ন হয়ে থাকিতেন ধ্যানে।
সর্ব্বদাই ব্রহ্ম নিয়া লীলা খেলা চলে,
স্থূলদৃষ্টি হারাইয়া আপনারে ভুলে।

মোর মাতা সিদ্ধিমাতা সর্ব্বরূপে জানি,
ব্রহ্মভাবে মধুর যোগে থাকিতেন তিনি।
সর্ব্বদা উদাসী ভাব সকল সময়,
নিজ দেহটির প্রতি দৃষ্টি নাহি রয়।
জিজ্ঞাসিলে মোর মাতা দিতেন উত্তর,
না পারি কহিতে বাপু আছি স্বতন্তর।
চারিদিকে ব্রহ্ম-অগ্নি ঘুরিয়া বেড়ায়,
জানিবে ব্রহ্মের সঙ্গে লীলা সর্ব্বদায়।
না পারি স্থূলের কথা আমি ত' বলিতে,
যা ইচ্ছা ঠাকুর করে কহি যে নিশ্চিতে।
পরম পদে স্থিত হয়ে কায়া নাহি রয়,
স্থূলের দৃষ্টি হারাইয়া দেখি ব্রহ্মময়।
সর্ব্বজ্ঞান জ্ঞান করি ব্রহ্মকে পূজিবে,
গুরু ব্রহ্ম জানি ইহা সর্ব্বদা মানিবে।

আগে মায়ের নিজের কথায় তাঁহার আত্মকথা ও চরিত্র প্রকাশ করা গেল।

আত্মকথা ও উপদেশ

(২)

"আমার পিতা ধর্ম্মপ্রাণ ও সজ্জন ছিলেন, তিনি সব সময় সন্ধ্যা পূজা নিয়া থাকিতেন, ত্রিসন্ধ্যা করিতেন এবং গায়ত্রী-গঙ্গায় মতি ছিল। মাতা শান্ত প্রকৃতির, সংসারে কাজ করিতে করিতে অন্তরে দেবী ভগবতীকে ভাবিতেন। তাঁহার কৃপণতা ছিল না। মাতুলালয়ে নৈলাতে জন্ম হয়। আমার মা বেশীদিন পিত্রালয়ে থাকিতেন। আমি মাতুলালয়ে থাকিতে খুব ভালবাসিতাম। বাল্যকালে যখন বয়স পাঁচ বৎসর তখন শিব পূজা করিতাম, মাকে বলিতাম আমার শিব পূজার আয়োজন করিয়া দিতে। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত সব ব্রত করিয়াছি। ১২ বৎসরে দীক্ষা নেই। গুরুদেব খুব স্নেহ করিতেন। পূজার মন্ত্র নিয়া ও স্থূল জগতের অনুষ্ঠান নিয়া খুব পূজা করিতাম। গুরুদেব আমায় পূজা সন্ধ্যার প্রণালী শিখাইয়াছিলেন। মা আমাকে খুব ভালবাসিতেন বলিয়া সব সময় কাজ কর্ম্ম করিতে দিতেন না। প্রায় সময় পূজা সন্ধ্যা নিয়া থাকিতাম। শ্বশুরালয়ে বেশীদিন থাকি নাই। পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে থাকিতাম। তখনও একটু আধটু দেবদেবীর দর্শন পাইতাম। তখন তা ধারণা করিতে পারি নাই। বার বৎসরে এক বাণী শুনিতে পাই যে, ২৪ বৎসর বয়সে কাশী যাইব, সেখানে স্তরে স্তরে নানা দর্শন পাইয়া সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়া দেহরক্ষা করিব। আন্দাজ ৫৫ বৎসর বয়সে সাধনার পরিসমাপ্তি

হইবে। কাশীধামে আসিয়া আমার সাধনার খুব উন্নতি হইয়াছিল। বাল্যকালে বালিকাদের সঙ্গে ঠাকুর সাজিয়া সাজিয়া খেলা করিতাম। রাধাকৃষ্ণ সাজা আমার খুব ভাল লাগিত। তখন হইতেই ঠাকুরের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিত। আমার মা আমায় সাহায্য করিতেন, যখন যাহা চাহিতাম মা আমায় তখন তাহাই দিতেন, কখনও কটুকথা বলেন নাই।"

(৩)

মায়ের বয়স যখন প্রায় ২৪।২৫ বৎসর তখন মা তাঁহার মাতা পিতা এবং স্বামীর সঙ্গে ৺কাশীধামে আসেন। কাশীধামে আসিয়া মা স্থূল সূক্ষ্ম জগতের দৃশ্য দেখিয়া আর দেশে ফিরিয়া গেলেন না। আমাদের পিতার ইচ্ছা ছিল যে পুনরায় দেশে গিয়া থাকেন। মা বলিলেন, "আমি আর দেশে যাইব না, আমার ত আর সংসার নাই, আমি এখানে সংসারের সার মাতা অন্নপূর্ণা ও বিশ্বনাথ পাইয়াছি। আর যাইব না, আপনার যাইতে হয় যান। আপনার সেখানে পুত্র কন্যা আছে আপনি গিয়া সুখের সংসার করুন।" সেই সময়ের কথা মা এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, "আন্দাজ ২৪ বৎসর বয়সে আমি নিজ মাতাপিতা ও স্বামীর সঙ্গে কাশী আসি। কাশীতে আসিয়া আমার খুব ভাল লাগিল, আর আমার দেশে যাইতে ইচ্ছা হইল না। কাশীতে আসিয়াই আমি ভগবানের দর্শন পাইতে লাগিলাম, আমার সাধনার খুব বিকাশ হইতে লাগিল।"

মা আমাদিগকে বলিলেন "আমি তোমাদের মত কখনও সংসার

করিতে পারি নাই, আমার সংসারটী মোটেই ভাল লাগিত না। তবে লোকজন খাওয়াইতে আমার খুব ভাল লাগিত। বাড়ীতে দুর্গোৎসব এবং অন্য উৎসবেও আমি রান্না করিতে খুব ভালবাসিতাম, এবং সকলে সুস্বাদে খাইত। আমার তাহাতে ক্লান্তি ভাবও আসিত না। আমি তখন হইতেই ভগবানের কাজ বলিয়া সব কাজ করিয়াছি। জানিতাম যে ঠাকুর ছাড়া কিছু নাই।"

"এই রকম পূজা উৎসবে রান্নাদি হইল দেশের কথা। কাশীতে আসিয়া দণ্ডী সাধু ভোজন করাইতে আমার স্বামীও খুব ভাল বাসিতেন, আমিও তাহাতে উৎসাহিত হইয়া কাজকর্ম্ম করিতাম। পরে যখন আমার সাধনার বেশী বিকাশ হইল তখন আমি আর কিছু করিতে পারিতাম না। তখন আমার স্বামী ব্রাহ্মণী (পাচিকা) রাখিবার জন্য আমাকে বলিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার ঠাকুর ত কাহারও হাতে খাইবেন না, আপনার ইচ্ছা হয় ত আপনি লোক রাখিতে পারেন। আমি যা হয় সিদ্ধটিদ্ধ দিয়া ঠাকুরের ভোগ দিব। যখন ঠাকুরের যা ইচ্ছা হইবে তাহাই করিব। তিনি বলিলেন 'আমিও খাইব না, কাশীর লোক ত চিনা যায় না।' তখন উনি নিজেই রান্না করিতেন, আর আমার খাওয়া দাওয়ার দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। ঠাকুরের যে এই দেহ তাহার উপরেও আমার কোন দৃষ্টি ছিল না। সর্ব্বদা আমার এই ভাবে কাটিত, ১৯ বৎসর প্রায়ই রাত্রিতে নিদ্রা যাইতাম না এবং প্রায়ই উপবাস যাইত। তিনি কোন কোন দিন জোর করিয়া আমাকে সরবৎ অথবা ঘোল খাইতে দিতেন। যখন যাহা জুটিত তাহাই

খাইতাম্, ঠাকুরকে অর্পণ করিতাম। খাওয়া দাওয়ার দিকে লক্ষ্য থাকিলে ত কিছুই হয় না। যখন শুইতাম তখন দেখিতাম যে ইষ্টদেবী আমাকে কোলে করিয়া শুইয়া রহিয়াছেন। এ রকম করিয়া কিছুদিন কাটাইবার পর আমার পিতার বিয়োগ হয়। মা যতদিন ছিলেন ততদিন মা-ই রান্না করিতেন। মা আমাকে রান্না করিতে দিতেন না। আমার এক মামা ছিলেন সাধু। তিনি অল্প বয়সেই হিমালয় চলিয়া গিয়াছেন। প্রায় ১৫ বছর পর দেশে ফিরিয়া ছিলেন। তিনি ভাল সাধক, তিনি আমার হাতে খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া দেশে আমাকে রান্না করিতে হইত। কাশী আসিয়া অবধি আমি দর্শন স্পর্শন নিয়াই থাকিতাম। আমি যখন যে মন্দিরে যাইতাম দিব্যভাবেই ভগবানকে দেখিতে পাইতাম, সেইজন্য আমার সেখানে গেলেই ভাবাবস্থা হইত। আমার মন মুগ্ধ হইয়া যাইত, উঠিয়া আসিতে পারিতাম না। কাজকর্ম্ম করিতে গেলে ভগবানের দর্শন এবং কথা শ্রবণে মন মুগ্ধ হইয়া যাইত, আর কিছু করিতে পারিতাম না। এইরূপে তিনি (স্বামী) থাকা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। কাশী আসিয়া প্রায় ১৮ বৎসর তাঁহার সঙ্গে কাটিয়া গেল, পরে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। তিনি দেশে থাকিতে চাকুরি করিতেন এবং দেশে বিষয় সম্পত্তিও ছিল। বিষয় সম্পত্তি তিনি নিজ পুত্রকে * দিয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া সাইনবোর্ড লিখিতেন এবং দুই একটী উপন্যাসও লিখিয়াছেন। তিনি কবিও ছিলেন,

* সপত্নীপুত্র, মায়ের কোন সন্তান হয় নাই।

গানটান লিখিতেন। তাহাতেই মাসে ৬০৲।৭০৲ এবং কোন মাসে ১০০৲ উপায় হইত। তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তিনি কোন দিন সঞ্চয় করিতে ভালবাসিতেন না। মাসে যা বাঁচিত তা গরীব দুঃখীকে দিয়া দিতেন, অথবা লোকজন খাওয়াইতেন। আমিও ঘরের কোন খোঁজ নিতাম না—কি আছে কি গেল। আমার গুরুর দৈনিক ৪ পয়সা, কিছু ফল আর ভিখারীদের জন্য আধসের চাউল ও কিছু খুচরা পয়সা তিনি আমাকে নিয়ম মত দিতেন। যখন আমি কোথাও কথা বা পাঠ শুনিতে যাইতাম তখন যা সিধাপত্র, কাপড় বা যখন যাহা দরকার হইত বলামাত্রই তিনি যোগাড় করিয়া দিতেন। তিনি খুব উদারচিত্ত ছিলেন। সুন্দর সুন্দর গান ও ভজন গাইতেন এবং সুন্দর সুন্দর গান বাঁধিতেন। এইরূপ আমরা ১৮ বৎসর ছিলাম। পরে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। দশবারো দিন সামান্য সর্দ্দি জ্বর এবং আমাশয়ে ভুগিয়া তিনি কাশীপ্রাপ্ত হন। তাঁহার অন্তিম সময়ে আমি সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিতাম এবং আবশ্যকমত শুশ্রূষা করিতাম।"

"ঠাকুরের কৃপায় আমি তাঁহার অন্তিম কালে বিচলিত হই নাই। শেষ দিনে রাত্রিতে অন্ধকার ঘরে তাঁহাকে নিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় আমি দেখিতে পাইলাম যেন ঘরে একটি চাঁদ উদয় হইয়াছে। ঘরে আর কেহ ছিল না। তখন সে আলো আসিয়া আমার চোখে লাগিল, আর তিনিও বলিলেন 'এত জোরে কেন আলো জ্বলিয়াছে? আলো যে আমার চোখে লাগে।' আমি

মনে মনে ভাবিলাম যে কই আলোত জ্বালি নাই। তখন চাহিয়া দেখি যে তাঁহার মাথার উপর নারায়ণ চতুর্ভূজরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমাকে ঠাকুর বলিলেন, 'আমি তাহাকে আমার সঙ্গে মিশাইয়া লইব।' তার অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল, দেখিতে পাইলাম তিনি নারায়ণের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। সূক্ষ্ম জগতে রথ, পতাকা, শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি হইতে লাগিল। আমি তাহাতে আনন্দে বিভোর হইয়া পাথরের শিলার মত ধ্যানাবস্থায় বসিয়া রহিলাম। শোক কি দুঃখ কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই ভাবে বসিয়া আছি তখন বাড়ীর লোকেরা আসিয়া রাত্রিতে বলিল, "মা, বাবার ত প্রাণ নাই। আপনি ত একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া আছেন।" আমি বলিলাম, "আমিত বাপু কিছু জানি না, তোমরা যা হয় কর।" তখন তাহারা আমার গুরু-মাকে খবর দিল এবং তাঁহার বন্ধু বান্ধব আসিয়াছিল। তাহারা পাঁচজনকে ডাকিয়া শেষ রাত্রে তিন চারটার সময় তাঁহাকে মণি-কর্ণিকায় লইয়া গেল, আমিও গেলাম। আমাকে তাঁহার শেষকার্য্য সকল করিতে হইয়াছিল। পরে তাঁহার ছেলে আসিয়া শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়াছিল। আমি মণিকর্ণিকা হইতে আসিয়াই কপাট বন্ধ করিয়া একেবারে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলাম। আমার গুরুমা আসিয়া কপাট খুলাইতেন। কোন দিন বা আমার হবিষ্যের যোগাড় করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কোন দিন বা আমি তাহা করিতে পারিতাম না, তখন তিনি ফল কি দুগ্ধ খাওয়াইতেন। পরে যখন সব কাজ শেষ হইয়া গেল তখন আমি

নিশ্চিন্ত হইয়া তিন চার দিন কপাট বন্ধ করিয়া একভাবে অনাহারে বসিয়া থাকিতাম। এই ভাবে কিছুদিন গিয়াছে। এইরূপ ভোজনের অনিয়ম অনেকদিন চলিয়াছে। এ সব ঘটনা খালিসপুরার বাড়ীতে হইয়াছে। গুরুমা মাঝে মাঝে আসিয়া রান্না * করিয়া খাওয়াইয়া যাইতেন। গুরুমা আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। তারপর মা দেখিলেন যে অনিয়মে আমার শরীর দিনের পর দিন খারাপ হইতেছে। আমায় আমাশায় ধরিল। তাঁহার বিয়োগের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে গুরুমা বলিলেন 'আমি এতদূর হইতে সর্ব্বদা আসিতে পারি না।' তখন মা আমাকে তাঁহার হারাড়বাগের বাড়ীতে নিয়া আসেন।"

(৪)

"তিনি (স্বামী) যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পর্য্যন্ত আমার ভাবাবস্থায় ঠাকুরের দর্শন ও দু একটা কথাও শুনিয়াছি। কাশীতে যত মন্দির সেখানে গিয়া দিব্যভাবে ঠাকুরের দর্শন হইয়াছে, তবে তখন আমি সব সময় ঠাকুরকে লইয়া ভাবেই থাকিতাম। বাহিরের আর কিছু দেখিতে ভাল লাগিত না। দেবালয়ে দর্শন ও ভাগবত কথা শ্রবণ করিতে যাইতাম। তাহাও

---

* ২০।২১ বৎসর মা খালিসপুরায় ও অন্য ২।৪ জায়গায় ছিলেন এবং আন্দাজ ১০ বৎসর হারাড়বাগে বাস করেন। এখানেই দেহরক্ষা করেন। পতির জীবদ্দশায় মা গুপ্ত ভাবেই ছিলেন, কেহ জানিতে পারে নাই।

বেশীদিন পারি নাই। তাঁহার বিয়োগের পরেই বাহিরের যত কিছু সব বন্ধ হইয়া গেল।"*

"দিন দিন সাধনার বিকাশ হইতে লাগিল। তখন আমি কপাট বন্ধ করিয়াই বাড়ীতে বসিয়া থাকিতাম। সকলে আমাকে খালিসপুরার মা বলিয়া ডাকিত। সেই সময়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এবং দু চার জন পণ্ডিত আসিতেন। তখন আমি তাহাদের সঙ্গে বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা বলিতে পারিতাম না। আমার লজ্জা হইত। আর একটি ছেলে বি, এ, পাশ, নাম প্রভাতকুমার (মেনু) আসিত। রাজবালা ও রত্নমণি এই দুইটি মেয়ে অধিকাংশ সময়ই আমার খালিসপুরার বাড়ীতে থাকিত এবং আমাকে দেখাশুনা করিত।"

"তারপর আমার সাধনার অন্য রকম বিকাশ হইতে লাগিল। আমার অঙ্গে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিক রূপে দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বীজমন্ত্র ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল এবং কেহ কেহ তাহা দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে লাগিল। সর্ব্বদা ভগবানের চরণ ও ওঁকার সর্ব্বাঙ্গে দেখা যাইত। আমি যে ঘরে থাকিতাম সে ঘরে সব জায়গাতেই ভগবানের চরণ ও মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। বিছানা মশারী সব স্থানেই ভগবানের চরণ দেখা যাইত। আমিত দেখিতে পাইতাম, অন্যেরাও দেখিতে পাইত। কায়াভেদ করিয়া যে বাণী বাহির হইয়াছিল প্রভাতকুমার ছেলেটি তাহার কিছু অংশ লিখিয়াছিল। পর পর সাধনার বিকাশ খালিসপুরাতেই হইতে লাগিল। পরে

* স্বামী বিয়োগের পর মা ঘরের বাহিরে যাইতেন না।

আমাকে গুরুমা অসুস্থ দেখিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। খালিসপুরায়ই লীলাদর্শন চলিতেছিল, তবে গুরুমায়ের বাড়ী আসিয়া আরও বেশী লীলা দর্শন হইতে লাগিল এবং কায়াভেদ করিয়া বাণী প্রকাশ বেশী হইয়াছিল। গুরুমায়ের বাড়ীতে আসিয়াই ব্রহ্মের লীলা খেলা আরম্ভ হইল। যত রকমে ব্রহ্মের দর্শন সম্ভব তাহা হারাড়বাগেই হয়।"

(৫)

মা নিজের দেহকে ঠাকুরের দেহ মনে করিতেন এবং পতিকে পরম ব্রহ্ম জানিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। ক্রোধ অভিমানাদি পরিত্যাগ করিয়া তিনি সর্ব্বদা জ্ঞান বৈরাগ্য নিয়া থাকিতেন। পরম পুরুষের ধ্যানে আকুল হইয়া মা যখন তাহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিতেন তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। অনেক সময় কেদারঘাটে তক্তাতে বসিয়া থাকিলে গঙ্গার স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইত, তথাপি বাহ্যজ্ঞান হইত না। পাণ্ডাগণ তখন যত্ন করিয়া তাঁহাকে উঠাইতেন। সাজি কমণ্ডলু জলে ভাসিয়া যাইত।

ঘরে রান্না বসাইলে জ্ঞান থাকিত না, তিনি দিব্যভাবে অভিভূত হইয়া থাকিতেন। এইদিকে ডাইল ভাত পুড়িয়া যাইত। ইহাতে স্বামী ক্রোধ প্রকাশ করিলে মা মিষ্টভাবে বলিতেন, 'গোবিন্দের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়াছেন, আমিত কিছুই জানি না। তাঁহার অপরূপ শোভা দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকি, আমি যে রাঁধিতে পারি না। করি কি?'

সেই সময়ের কথা তিনি এইরূপ বলিয়াছেন :—

অপরূপ শোভা তার দেখিতে দেখিতে,
অচল হয় যে অঙ্গ চিন্তা নাই তাতে।
কিবা গেল কিবা আছে কোথায় আছি আমি,
গোলোক বৈকুণ্ঠধাম দেখিতে পাই স্বামী।
সংসার ভুলিয়া আমি যাই একেবারে,
থাকি না আমাতে আমি কি কহিব কারে ?
রন্ধনশালায় মোর প্রভু ভগবান,
বাক্য সুধা মধুপানে মাতায় যে প্রাণ।
সুললিত স্বর তাঁর সুন্দর মূরতি,
জ্ঞান হারাইয়া যাই নাহি থাকে স্মৃতি।
রন্ধন পুড়িয়া যায় কি করিব আমি,
সংসারের সার বস্তু দেখিতে পাই স্বামী।
জগদম্বা মাতা আসে আদর করিয়া,
কোলে তুলে লয় মোরে যতন করিয়া।
মায়ের সঙ্গে কথায় কথায় থাকি অহর্নিশি,
অনিত্য সংসার দেখি সার সত্য তিনি।
মায়ের কোলে থাকি আমি বসিয়া যখন,
রান্নার কথা ভুলে গিয়ে করি যে ক্রন্দন।
সর্ব্বদা দেখিতে পাই ইন্দ্র চন্দ্র আদি,
তাঁহাদের সঙ্গে কথা কহি নিরবধি।

ইন্দ্রিয়ের সুখ দুঃখ সকল ভুলিয়া,
একাগ্র মনেতে শুধু প্রভু চিন্তা নিয়া।
দেহ আমার তাই ভাবনা নাই মনে,
পারি না সংসার কার্য্য করিতে এখনে।
উঠাইতে ঘটি বাটী হাত হ'তে পড়ে,
ধাতু দ্রব্য ছুইলে পরে হাত বাঁকা করে।
কি করি উপায় আমি বুঝিতে না পারি,
অচল হয় যে অঙ্গ চলিবারে নারি।
প্রভু বলে বৃথা কার্য্যে কিবা প্রয়োজন,
সঙ্গে আছি আমি তোমার অমূল্য রতন।
মূল হইতে অষ্টদল বিকশিত যার,
ব্রহ্ম পারে যাবে তুমি কিবা চিন্তা তার ?
আমি তোমায় সব করাব সন্ন্যাস যে দিয়া,
থাকিবে না সংসারেতে তোমার যে হিয়া।
মম লীলা অগণন দেখিতে পাইবে,
ব্রজলীলা সার তত্ত্ব যখন দেখিবে।
মুগ্ধচিত্তে হবে তুমি সর্ব্বদা মগন,
ভাসিয়া উঠিবে কত তত্ত্ব অগণন।
আমি কহি ওহে প্রভু কবে যে দেখিব,
কখন তোমার তত্ত্ব জানিতে পারিব ?
প্রভু কহে যখন তোমার একনিষ্ঠ মন,
পাইবে অবশ্য তুমি দেখিতে তখন।

সেই হেতু এই মন তাঁহারে সঁপিয়া,
দিয়াছি আপন কায়া চরণে অর্পিয়া।

(৬)

মা যখন সাধন করিতেন কোন কোন সময় গঙ্গার জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া থাকিতেন। তখন মায়ের অদ্ভুত দর্শন হইত। গঙ্গা আসিয়া মায়ের কোলের উপর বসিতেন, মায়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেন। মা তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া জলেই থাকিতেন এবং বলিতেন, "কি সুন্দর বর্ণনাতীত দিব্যরূপ! স্থূল জগতে তোমরা সামান্য দৃশ্য দেখিয়া ভুলিয়া যাও। সূক্ষ্ম জগতে যে কত সুন্দর বস্তু আছে তাহা বলা যায় না।" যখন মা গঙ্গা হইতে উঠিতেন তখন তিনি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া টলিতে টলিতে বাড়ীর দিকে আসিতেন। মাঘমাস, পৌষমাস, ভিজা কাপড়, কাপড়খানা নিংড়াইয়া লইতেও হুঁস থাকিত না। যখন রাস্তায় এরূপভাবে আসিতেন রাস্তার লোক বলিত, 'তুমি ভিজে কাপড়ে যাচ্ছ কেন মা?' তখন মায়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিত। যাহারা মাকে চিনিত না তাহারা বলিত, 'মায়ের বোধহয় একটু শুচিবাই আছে।' মা একটু হাসিয়া বলিতেন—'ঠাকুরের ইচ্ছা।' মনে পড়িত, 'কাপড় চোপড় ত সব ঘাটে ফেলিয়া আসিয়াছি।' তখন ফিরিয়া গিয়া আবার কাপড় লইয়া আসিতেন। পাণ্ডারা বলিত, 'মা তোমার কাপড় ফেলিয়া গিয়াছ, এই নাও।' কোন কোন দিন কাপড় ছাড়িতেন, কোন কোন

দিন বা ভিজা কাপড়েই চলিয়া আসিতেন। বাড়ী আসিয়া ঘরে খুজিতেন, 'কোথায় কাপড় ?' তখন মায়ের মনে হইত, 'ওঘাটে নিয়ে গিয়েছিলাম ত।' এ রকমভাবে কত দিন চলিয়া গিয়াছে। মায়ের সাজি, কমণ্ডলু, কাপড় অনেক হারাইয়াছে।

মা ঘরে যখন ধ্যান করিতে বসিতেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। মা ঘরে থাকা সত্ত্বেও অনেকবার চোর চুরি করিয়া গিয়াছে, মা কিছুই টের পান নাই। পিতা আসিয়া দেখিতেন যে ঘরে কিছু নাই। মাকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে ঘরের জিনিষপত্র সব কি হইল ?

মা বলিতেন, 'কই আমিত কিছুই জানি না। কে জানে আপনাদের ঠাকুরের জিনিষপত্র সব কি হইল ?' পিতা বলিতেন, 'এখন কি হইবে ? বাসনপত্রও কিছুই নাই।' মা বলিতেন, 'মাটীর বাসন ত বাজারে পাওয়া যায়, পাতা আর মাটীর বাসন কিছু নিয়া আসুন, তাহাতেই ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইবে।' পিতা আবার সমস্ত বাসনপত্র কিনিতেন। তখন মা রান্নাবান্না করিতেন। যেদিন মা উঠিতে পারিতেন সেদিন রান্না করিতেন আর যেদিন ভাবাবেশে থাকিতেন সেদিন পিতাই রান্না করিতেন। মাকে খাওয়ার জন্য ডাকিলে মায়ের হুঁস হইত না। সেজন্য পিতা কতদিন রাগ করিয়াছেন। মা তাহাতে একটুও কথা কহিতেন না, কেবল ঘোমটা দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন। মা সর্ব্বদা ঘোমটা দিয়া থাকিতেন। কেহ ঘরে থাকুক বা নাই থাকুক ঘোমটা দিয়াই আসনে বসিয়া থাকিতেন। কোনদিন শৌচে যাইবার সময়

অর্দ্ধেক পথেই স্তম্ভিত হইয়া অনেক সময় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। ঘটি হাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য। এই রকম কতদিন হইয়াছে। তখন বাড়ীর লোকেরা ডাকিয়া মাকে বলিত, 'ওমা আপনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? যান, অনেক বেলা হইল যে।' মা বলিতেন, 'তাই নাকি? আমি ত তা বুঝিতে পারি নি।' তখন মায়ের জ্ঞান আসিত ও শৌচে যাইতেন। শৌচে গিয়াও তিন চার ঘণ্টা দেরি হইত। সেখানে যাইয়াও তাঁহার জ্ঞান থাকিত না। যখন জ্ঞান ফিরিত তখন মা আপনা হইতেই উঠিয়া আসিতেন। মায়ের এই রকম প্রত্যেক কাজেই ভাবাবেশ হইত। সেজন্য মা সংসারের কাজগুলি করিতে পারিতেন না। তাহা না হইলে মা প্রথম বয়সে অনেক নিমন্ত্রণের রান্না করিয়াছেন। মা খুব ভাল রান্না করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে বড় বড় যজ্ঞিরান্নার সময় মাকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেন। মা যখন নিজের শ্বশুরালয়ে, পিত্রালয়ে ও মাতুলালয়ে থাকিতেন তখন এইরূপ ঘটিত।

(৭)

মা যখন স্থূলেতে পূজা করিতেন, পত্রপুষ্প অর্পণ করিতেন, ঠাকুর পা বাড়াইয়া দিতেন। নৈবেদ্য সাজাইলে গোপাল বেশে তখন কৃষ্ণ আসিয়া বলিতেন, "আমায় ঐগুলি খাইতে দাও।" নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলে দেবতা তাহা গ্রহণ করিতেন। মালা চন্দন অর্পণ করিলে গলা বাড়াইয়া অতি নম্রভাবে মালা লইতেন।

তখন ঠাকুর মাকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, "সর্ব্বদা একমন হইয়া থাকিবে। মনকে জলের মত করিবে, তাহা না হইলে ভগবান পাওয়া যায় না। রাত্রে নিদ্রা যাইবে না। স্বপ্ন আসিলে দোষ হয়। সংসারের কথা সব ভুলিয়া যাইবে। সঙ্গ করিবে না। সর্ব্বদা যাহা করিবে ঠাকুরের দোহাই দিয়া করিবে। তাই বলিয়া কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া ঠাকুরের দোহাই দিলে ঠাকুর তাহা মানিবেন না। সেই কাজ কখনও ঠাকুরের ইচ্ছায় হয় না। আপনার মনকে সর্ব্বদা গঠন করিতে হয়। যেমন বেনেরা সমস্ত দ্রব্য ওজন করে সেইরূপ নিজের দোষগুণ ওজন করিবে। সর্ব্বদা মনে বিচার বুদ্ধি রাখিবে, তবে তোমাদের দোষগুণ বুঝিতে পারিবে। সর্ব্বদা নত শিরে থাকিবে। অহঙ্কার ত্যাগ, মান অপমানে সমতা লইবে। নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করিবে। মৃত্যুকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিবে। তাহাতে বিবেক আসিবে।" মা বলিতেন, "ঠাকুর এই সব শিক্ষা আমায় দিয়াছেন, সেজন্য তোমাদেরও বলিতেছি, তোমরা সাবধান হও। ভগবানের কাছে সর্ব্বদা প্রার্থনা কর যে আমরা কত অপরাধ করিয়াছি। প্রভো! আমাদেরে চরণে স্থান দাও, আমরা কত অপরাধী। ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাক। ব্যাকুলতা না আসিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। যেমন সংসারে স্বামীপুত্রকে ভালবাস তাহার চাইতেও বেশী করিয়া ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। তবেই দেখিতে পাইবে যে ভগবান তোমাদের কত ভালবাসেন। মনে যখন কোন রকম কামনা আসিবে

সে সব মনে স্থান দিবে না। বলিবে যে, এইমন ভগবানকে অর্পণ করিয়াছি, আমার আর বাসনা আসিতেছে কেন? প্রভো, তুমি আমায় ক্ষমা করিয়া তোমার কামনা দাও। প্রভু, তুমি আমার হৃদয়ে থাক, যেন আর কেহ না আসিতে পারে। সংসারে যত ঝঞ্ঝাবাত্যা আসিবে তখন ঠাকুর বলিয়া রোদন করিও। মনকে শূন্য না করিলে ভগবান পাওয়া যায় না। সর্ব্বদা ভগবানের বিরহে কাতর হইবে। তাঁহার বিরহ না হইলে পরে তিনি আসেন না। তৈলধারার মত মনের ধারা বহাইতে হইবে। সর্ব্বদা একান্ত হইয়া থাকিবে। মনের কোণে বসিয়া ভগবান পাওয়া যায়। মনকে কোণে বসাইবে। কলির জীব বনে সাধনা করিতে পারে না। ঘরের কোণে বসিয়া সর্ব্বদা গুরুর চরণ ধ্যান, মানসপূজা এবং ভগবানের বিরহে রোদন করিবে। মানুষ জন্ম লইয়াছে কিসের জন্য? সেই ভগবানের জন্যই জন্ম নিয়াছে। যদি তাহা লাভ না করিতে পারিলে তাহা হইলে ত বৃথাই জন্ম গেল। মানুষ মানে হুঁস চাই, সেই হুঁস লইয়া সর্ব্বদা ঠাকুরের ধ্যান, মূলমন্ত্র জপ। যাহা কিছু কার্য্য করিবে মনে করিবে ঠাকুরের জন্য করিতেছি। আমার বলিতে এক গোবিন্দই আছেন। সংসারে যখন থাকিবে তখন জানিবে যে আমি নাই, ভগবানই আছেন। কিন্তু ভগবানের যখন সাধনা করিবে তখন ভাবিবে, আমি আছি আর আমার ইষ্ট আছেন। সর্ব্বদা হাস্যভাবে ইষ্টের সেবা করিবে।

গান

মন মানসে আপনি বসে বসাবি হৃদি সিংহাসনে।
করবি পূজা উপচারে, বলি দিবি আপনারে,
ডাকবি সেই শ্যামা মারে, নামটী ধরে,
রক্ষা কর মা আমারে।
পারি না বিষের জ্বলনে, সংসারে বিষ সর্ব্বক্ষণে।
দে মা আমায় চরণ তরি, ভক্তি নাই মা ও শঙ্করী।
ক্ষমা করে রাখ যদি, পার হয়ে যাই ভবনদী।

(৮)

মা কোথাও দর্শন করিতে গিয়া ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতেন। সেখানে বসিয়া থাকিতেন, ইষ্টের সঙ্গে কথা কহিতেন, খেয়াল থাকিত না যে রাত্রি হইয়া গিয়াছে। এইদিকে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে বাড়ীতে না পাইয়া লণ্ঠন হস্তে বাহির হইতেন খুঁজিতে। কখনও গঙ্গাতীরে, কখনও অন্নপূর্ণার বাড়ীতে মাকে ভাবস্থ অবস্থায় পাইতেন এবং তাঁহাকে ঘরে নিয়া আসিতেন। বাড়ী আসিয়া ঘরের কোণে আবার ভাবেতে ডুবিয়া যাইতেন, আহার করিতে ভুলিয়া যাইতেন। তখন ঠাকুর আবির্ভূত হইয়া নানা কথা বলিতেন।

তখন ঠাকুর আসি আবির্ভূত হয়ে,
নাম করিয়ে ডাকে মাকে আদর করিয়ে।

ঠাকুর বলেন তুমি খাও কিছু আর,
কণ্ঠদেশ শুষ্ক তব দেখি যে এবার।
ক্ষুধা নাই তব যে জানি সর্ব্বক্ষণ,
নামে মগ্ন আছ তুমি সচৈতন্য মন।
উপবাসে কিবা কাজ আমি যে তোমার,
সচৈতন্য ব্রহ্মময়ী হইবে এবার।
কীর্ত্তন করিবে তুমি আনন্দ করিয়া,
শুনিব তোমার গান আমি ত বসিয়া।
মা বলিলেন কেমন যে কীর্ত্তন না জানি,
ঠাকুর বলেন সব কিছু শিখাইব আমি।
জ্ঞান বৈরাগ্য নাম কীর্ত্তন সকল জানিবে,
পরম বৈরাগ্য নিয়ে সংসারে থাকিবে।
সংকীর্ত্তন শিখাইব সুন্দর করিয়া,
নামের মহিমা মম দুনিয়া ভরিয়া।

ঠাকুরের গান ঃ—

শুন গো জননী মম নাম খানি,
ভক্তিমন্ত্র তুমি শিখেছ যতনে।
হরিনাম সুধা নাশে ভব ক্ষুধা,
নামামৃত পান করিবে যে জনে।
সর্ব্ব সময় সেজন চিত্ত দিয়ে মোকে,
হরিনাম রসে ভাসে ইহলোকে।

নামের গুণেতে সংসার নাশিয়া,
আপন বলিয়া আদর করিয়া।
আমাকে সেজন ভাল ত বাসিয়া,
রাখে তব সব হৃদয়ে ধরিয়া।
হরির নামে হয় সংশয় নাশন,
বিপদ ভঞ্জন আমি মধুসূদন।

(৯)

কাশীধামে খালিসপুরার বাড়ীর দোতালায় মায়ের তিন চার খানা ঘর ছিল, একটী ঘর মায়ের আসনের ছিল, সেই ঘরে মা সর্ব্বদা ধ্যান করিতেন। আসনের জায়গাটি শুধু পরিষ্কার করিতেন, আর কোন স্থানে হাত দিতেন না। সর্ব্বদা আবর্জ্জনায় ভরিয়া থাকিত। ইঁদুর সর্ব্বদাই উৎপাত করিত, তাহাতেও মায়ের গ্রাহ্য ছিল না, মা সেই দিকে মোটে লক্ষ্য দিতে পারিতেন না। মা সর্ব্বদাই ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় ভাবাবেশেই থাকিতেন। নিজের দেহ বলিয়া জ্ঞান ছিল না। মায়ের গায়ে কত ময়লা মাটী থাকিত। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি মায়ের হাতে যে শাঁখা ও সুবর্ণের চুড়ি ছিল তার উপর এত ময়লা জমিয়া গিয়াছিল যে তাহা সুবর্ণের চুড়ি কি শাঁখা বুঝা যাইত না। মা দর্পণে মুখ দেখিতেন না। দর্পণে মুখ দেখিতে গেলে মনে হইত যে একি করিতেছি? ঠাকুরের কাছে আছি মুখ দেখিব কেন? এই মুখ ত আমার নয়। ঠাকুরের মুখ যে অতি সুন্দর। আমি

দর্পণে মুখ দেখিলেই আমার জ্ঞান হইবে। দূর, এই ছাইপাশ কেন মনে আসে? মা সেইজন্য দর্পণে মুখ দেখিতেন না। মা তাঁহার ভক্তদেরও এই কথা বলিতেন। যাহারা ভগবানকে চায় তাহারা বিলাসী ভাব একদম ত্যাগ করিবে। তিনি বলিতেন যে, সর্ব্বদা ভগবানের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। দর্পণে মুখ দেখিলে অন্য ভাব আসিয়া যায়, দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিতে হয়। সাধন অবস্থায় কখনও এইসব করিতে নাই। মা তিন চার দিন এক আসনে বসিয়া থাকিতেন। রাত্রে নিদ্রা যাইতেন না, দিনে আহার করিতেন না। একদিন আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। রাত্রি তখন প্রায় আটটা। ঠাকুর আসিয়া মাকে বলিতেছেন—'তুমিও খাবে না আমাকেও খেতে দেবে না, আমার যে গলা শুকিয়ে গেল। ভক্তের কষ্ট হ'লে আমার বড় কষ্ট হয়।' সেই হইতে মা আসনে বসিবার সময় একটু গুড় ও একটু গঙ্গাজল নিয়া বসিতেন। যখন দেখিতেন যে তৃষ্ণার ভাব হইয়াছে তখন একটু গুড় আর গঙ্গাজল খাইতেন। সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া যাইত। কোন দিন সকালে উঠিতেন, কোন দিন বা উঠিতেন না। ঠাকুরের দর্শন মায়ের অগণিতভাবে হইতে লাগিল। কত রকম দেবতা আসিয়া মাকে সিদ্ধি লওয়ার জন্য সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। মা বলিলেন, 'আমি কিছুই চাই না। আমি শুধু সেই মহাগুরু জনার্দ্দনের চরণ চাই। তোমরা আমাকে ভুলাইতে পারিবে না।' তখন মাকে তাহারা ভয় দেখাইতে লাগিল। মা তাহাতে ভয় না পাইয়া নারায়ণকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ চক্রহস্তে

আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'ভয় কি ? আমি ত আছি।' মা বলিলেন, "প্রভো, তুমি আছ ? তবে আমার আর ভয় কি ? তাইত তোমাকে ডাকছিলাম। তুমি যে আমার পরম বন্ধু। আমি সিদ্ধি টিদ্ধি কিছুই চাই না, তা দিয়ে আমাকে ভুলাতে পারবে না। আমি যে ভুলবার মেয়ে নই। আমি তোমার দাসী। প্রভো, আমাকে ছলনা করো না। নিজ গুণে সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করো। 'তুমি ত আমার সর্ব্বস্ব। তোমার চরণের রেণু করে আমাকে রেখো।" তখন ঠাকুর মাকে বলিলেন, 'তুমি যে আমার চক্ষের মণি। তোমার সমস্ত ভারই আমি নিয়েছি। ক্রমান্বয়ে তুমি উন্নতির দিকে চলেছ।' ঠাকুরের সঙ্গে মায়ের এই রকম সর্ব্বদাই কথা হইত। কেহ মায়ের ঘরের কাছে গেলে ভাবিত যে মা কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছেন, এখন যাইব না। পরে দেখিত যে ঘরে অন্য কেহ নাই। মা নিজেই কথা কহিতেছেন। কোন সময় কেহ যাইলে মনে হইত যে মা যেন কাহারও সঙ্গে কলহের ন্যায় কথা কহিতেছেন। আবার কখন মনে হইত যে স্তব করিতেছেন, আবার দেখা যাইত যে কাঁদিতেছেন, আবার মনে হইত হাসিতেছেন। মায়ের এইরূপ ভাব দেখিয়া অনেকে স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

(১০)

অনেকে মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের পর মাকে দর্শন করিতে আসিতেন ও উপদেশ চাহিতেন। মা বলিতেন, "নিরন্তর

ভগবানের শ্রীচরণে মন দিবে। সংসারের কাজকর্ম্ম যাহা কিছু করিবে সবই ঠাকুরের চরণে সমর্পণ করিবে। সংসার অসার ও অসত্য। ভক্তিভাবে ইষ্টসেবা করিলে মা প্রত্যক্ষ হইয়া নানা কথা বলেন।"

যতই সংসার দেখ অনিত্য সকল,
নিত্য বস্তু গোবিন্দ সে জানিবে কেবল।
অহর্নিশি ইষ্ট সেবা করিবে মনেতে,
হাতে কাজ কর্ম্ম কর দৃষ্টি রাখ তাতে।
ঠাকুর ছাড়া আর গতি নাই এই ভবে,
সর্ব্বদা তাঁহার তরে মন প্রাণ দিবে।
আকুল হইয়া সদা ডাকিবে তাঁহারে,
মন প্রাণ সঁপে দিবে তাঁহারই তরে।
দেখ মায়া মোহ যত ঘোর অন্ধকার,
মায়াতে যে চক্ষে জল পড়ে অনিবার।
ঠাকুরের জন্য যদি একবিন্দু পড়ে,
তিনিও রাখেন তারে হাসিয়া অন্তরে।
যখন সময় পাবে বসিতে ধ্যানেতে,
ব্যাকুলতা আকুলতা লইয়া মনেতে।
বলিবে প্রভুর কাছে কেহ নাহি আর,
আকিঞ্চন দাও প্রভু মনেতে আমার।
তোমার চরণ যেন ধরিয়া মনেতে,
সর্ব্বদাই থাকি যেন তোমার ভাবেতে।

জিহ্বা অগ্রে শুধু যেন তব নাম করি,
এ রসনা তৃপ্ত হ'ক তব নামে হরি।
পারি না সংসার আর জঞ্জাল মায়ার,
কতদিনে দুর্দৈব কাটিবে আমার ?
দোষ অপরাধ প্রভু ক্ষমিয়া সকল,
জ্ঞান বৈরাগ্য দাও প্রভু করিয়া মঙ্গল।

এই রকম করিয়া ভগবানকে ডাকিতে হয়, তাহা না হইলে মনের ময়লা কাটে না। মনের মধ্যে কত যে খুটিনাটি আছে তাহা কি তোমরা বুঝিতে পার ? তাহা ধরিতেই পার না। যখন তোমরা ধ্যান করিতে বস তখন হাউ হাউ করিয়া কাঁদিলে কি হইবে ? মনকে সর্ব্বদা গড়িতে হয়। নিজ দোষগুণ ধরিতে হয়। পরের দোষের অনুসন্ধান করিতে নাই। মনে করিতে হয় যে আমার মধ্যে কত দোষ আছে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে কত দোষ বাহির হয়। কেহ যদি কাহাকেও ভালবাসে তাহা দেখিয়া তোমাদের মনে হিংসা আসে। তুমি যদি প্রকৃত পক্ষে তাহাকে ভালবাস তবে সে কি তোমাকে ভাল না বাসিয়া থাকতে পারে ? এই ত মানুষের কথা বলিলাম। ভগবানের কাছেও সেই রকমই কথা।

তোমরা বল যে অমুকের ভগবানের দর্শন হইয়াছে, আমার হইল না কেন ? সব জায়গায়ই বীজ বপন করা হয়। যে জায়গায় যে রকম ভূমি সে রকমই গাছ হয়। কোন স্থানে গাছ ও ফল হয়, কোন ভূমিতে বা গাছ হয় না, সে জন্য ভূমি তৈরী করিতে হইবে। রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, লোভ একটু

একটু করিয়া কমাইতে হইবে। একেবারে কেহ সিঁড়ির উপর উঠিতে পারে না, একটী একটী করিয়াই সিঁড়ি উঠে। একপা একপা করিয়া ভগবানের রাস্তায় অগ্রসর হইতে হইবে। সেই পথের পথিক কাহাকেও দেখিলে পথের সন্ধান নিতে হইবে। মনের ময়লা যাহাতে কাটে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। মনের কাছে সর্ব্বদা ক্ষমা চাও, এইরূপ করিয়া বলিবে যে মন, আর ত পারি না। অনিত্য বাসনা নিয়া কতদিন থাকিবে? এইবার যাহাতে উদ্ধার হইতে পার তাহার চেষ্টা কর। আপনার শরীরকে সর্ব্বদা যত্ন করিও না। শরীরকে যত্ন করিলে আমিত্ব জ্ঞান আসে, আমিত্ব থাকিলে সবগুলি দোষই থাকিয়া যায়। যেমন ধোপারা সোডা সাবান দিয়া কাপড় কাচে, তাহাতে মলিন বস্ত্র পরিষ্কার হয়, তেমনি বিবেক দিয়া বৈরাগ্যের পাথরে মনকে আছাড় দিবে, তাহা হইলে দেখিবে ক্রমে ক্রমে মনের মলিনতা কাটিয়া যাইবে। মান অভিমান দূর না হইলে মলিনভাব কাটে না। অভিমানের দ্বারাই ক্রোধ আসে, ক্রোধ আসিলে তাহার সঙ্গী কামও আসে, তাহাতেই জীবের ভোগ বাসনা হয়। এই পথে সর্ব্বদা বিবেক বৈরাগ্য নিয়া থাকিতে হইবে। সর্ব্বদা মনে পবিত্রভাব রাখিবে। মনে কোন রকম প্যাঁচ রাখিও না। সোজা রাস্তায় চল, বাঁকা পথ কণ্টকময়। মনপ্রাণ দিয়া ভগবানকে ডাক।

(১১)

শিবরাত্রিতে বা অন্যান্য বিশেষ পর্ব্বে ভক্তেরা মায়ের পূজা করিতেন। তীব্র ইচ্ছা নিয়া বহুলোক মাকে পূজিতে আসিত। মা আসনে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন। মা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেন এবং নিজে সামান্য প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বাকী প্রসাদ সকলকে বণ্টন করিয়া দিতে বলিতেন। উৎসবে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হইত, বিশেষ বিশেষ দিনে কীর্ত্তন, হরির লুট প্রভৃতি হইত। মা বাহ্য আচার নিষ্ঠা অত্যন্ত মানিতেন। সর্ব্বদা পবিত্রভাবে থাকার জন্য কিছু জাতিবিচার ছিল, তবে কেহ ভক্তিভাবে তাঁহাকে পূজা করিলে তিনি বিনাবিচারে তাহা গ্রহণ করিতেন। কেহ দীক্ষা প্রার্থী হইলে মা শিক্ষা দিতেন। দীক্ষার জন্য পীড়া-পীড়ি করিলে বলিতেন, 'ঠাকুর কৃপা করিলে পাইবে'। কিছুদিন পরে সেই ভক্ত মায়ের কাছে মন্ত্র পাইত। মা কখনও কানে মন্ত্র দিতেন না। মা মন্ত্র লিখিয়া দিতেন, সেই মন্ত্র মাকে শুনাইতে হইত, তখন তিনি বলিতেন, 'দীক্ষা হইল'। অনেক সময় মায়ের গায়ে বীজমন্ত্র ফুটিয়া উঠিত, ভক্ত মন্ত্র দেখিয়া গ্রহণ করিত। তাঁহার এই ভক্তিহীনা শিষ্যা বাহুর উপর ইষ্টমন্ত্র দেখিতে পায়। তাঁহার দক্ষিণ বাহুমূলে চরণের শোভা, কপালে ওঁকার ও বক্ষে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার মন মুগ্ধ হয়। তার পর নানারূপ মন্ত্র তন্ত্র মায়ের অঙ্গে দেখিতে পায়।

মায়ের উপদেশ

"শুদ্ধমন নিয়া সর্ব্বদা ভগবানের ভজনা করিবে। গুরু গোবিন্দ এক ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। সর্ব্বস্ব না ছাড়িলে সর্ব্বস্ব ধন পাওয়া যায় না, তবে তোমরা সংসারী, একটু একটু করিয়া ছাড়িতে হইবে, তাহা হইলে আস্তে আস্তে অভ্যাস হইয়া আসিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে ভগবান ছাড়া আর কেহ নাই। এইটী মনে রাখিলে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। জ্ঞান আসিলেই বিবেক আসে। যে জ্ঞানে ভগবানের উপলব্ধি হয় সে জ্ঞানই হইল জ্ঞান। বিদ্যায় যে জ্ঞান হয় তাকে জ্ঞান বলা যায় না, তাতে অহঙ্কার আরও বাড়িয়া যায়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুর সন্ধান না পাইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল ভাল গ্রন্থ পড়িতে অভ্যাস করিবে। তোমরা শুধু বসিয়া তাস পাশা খেলিয়া দিন কাটাও। ভাল ভাল বই পড়িলে মন কিছু খুলে। আর বৃথা খেলা করিও না, সর্ব্বদাই মনকে লজ্জা দাও। ওরে মন, সংসারে আসিয়া কি সুখ করিলি, তোর কি লজ্জা নাই? মনে ধিক্কার না আসিলে বিবেক আসে না। বিবেক না আসিলে ভক্তি হয় না। দেখ, নিজের মধ্যে অনেক জিনিষ আছে। এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইতেছ, এ দেহটা হইল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ইহার ভিতর সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সেইজন্য প্রস্তুত থাক। তোমরা চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিলে কি দেখিতে পাইবে? চোখ খুলিবার চেষ্টা কর, যে চোখ খুলিলে আর অসার সংসারের দৃষ্টি হয় না। এই মনে করিওনা যে আমরা খুব উপরে উঠিয়াছি। যতক্ষণ

পর্য্যন্ত মন গঠন না করা যায় ততক্ষণ কোন দর্শন হইলেও কিছুই ঠিক হয় না। শকুনিগুলি অনেক উচুতে উঠে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি থাকে গো-ভাগাড়ে। ইহাতে কি তাহাদের কিছু হয়? দেখ, তোমরা এত দর্শন পাইয়াও যদি সংসারের প্রতি লক্ষ্য রাখ তাতে যে শকুনির মত উচুতে উঠা হইল। সেজন্য বলিতেছি সর্ব্বদা নিরহঙ্কার হইয়া ভগবানকে ডাক যেন মনে কোনরূপ অহঙ্কার না আসে। ইহা মনে করিয়া সাধন ভজন করিওনা যে সকলে আমায় মান্য গণ্য করুক, আমি খুব নামী হই। বেশী নামী হইতে গেলে অহং আসিয়া যায়। প্রচারক হওয়া ভাল নয়। সমতা নিয়া সর্ব্বদা থাকা উচিত। মান অপমান সর্ব্বদা সমান জ্ঞান করিতে হইবে। সকলের কাছে খুব নিচুও হইবে না, খুব উচুও হইবে না, মধ্যম হইয়া থাকিবে, এরই অর্থ সমতা। কেহ আমায় মান্য করুক বা না করুক তাহাতে আমার সুখ দুঃখ নাই। কেহ কাছে আসিলে ভাল, না আসিলে আমার আরও ভাল। আমি একা থাকিতে খুব ভালবাসি। আমার ঠাকুর থাকে আর আমি থাকি। ইহার চেয়ে আর কি আনন্দ আছে? তোমরা সাধন কর দেখিবে ঠাকুর তোমাদের সঙ্গে কথা কহিবেন। তোমরা এখন মনে কর যে মা এই সব কি বলিতেছেন? কেহ বিশ্বাস করে, কেহ হয়ত করে না, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য বলিতেছি।

সর্ব্বদা কোমল প্রাণে ভগবানকে ডাকিতে হয়, তাঁহার কাছে কঠিন হইতে হয় না। যেমন তোমরা ঘরের আত্মীয়-স্বজনকে

ভালবাস, তাহাদিগকে এক মিনিট না দেখিলে অস্থির হইয়া যাও, যাহাকে তোমরা ভালবাস তাহার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়ে, তেমনি ভাবে ভগবানকে ভালবাসিতে হইবে। ভগবানের কথা যেন এক মিনিটও মন হইতে সরিয়া না যায়। যদি কোন প্রকারে সরিয়া যায় ত নিজের গালে নিজে চড় খাইবে। মনকে এত দুর্ব্বল রাখিও না, সরল কর। মন দুর্ব্বল থাকিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সংসারের বাসনা সব ত্যাগ কর। বাসনা এবং ইচ্ছা থাকিলেই মনে দুর্ব্বলতা আসে। নিজের মনকে যদি বশ না করিতে পার, তাহা হইলে ভগবানকে বশ করিবে কি প্রকারে? ভগবান অতিশয় কঠিন, আবার অতিশয় কোমল। তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে তিনি কোমল ভাবেই আসিয়া দেখা দেন। তোমরা যদি নিজের স্বামী পুত্র বা স্ত্রীকে মন প্রাণ দিয়া ভাল না বাস, তাহা হইলে কি তাহারা তোমায় ভালবাসে? যেইরূপ তোমরা ভালবাসিবে, তাহারাও তোমাদিগকে সেইরূপই ভালবাসিবে। তোমরা বড় বৃথা কাজ কর। বৃথা কাজ না করিয়া সময় পাইলেই নাম ও ধ্যানে মন দাও। সর্ব্বদা তাহার চরণে আকিঞ্চন কর। বৃথা মায়া মোহে ডুবিয়া থাকিও না। কি গেল কি আছে তাহার হিসাব করিও না। কামিনী কাঞ্চন হইতেছে সংসারের বিষ। পুরুষের যেমন কামিনী বিষ, স্ত্রীর তেমনি পুরুষ বিষ। তবে যাহারা সংসারী লোক তাহাদের স্বামীকে ভগবানভাবে সেবা করা উচিত। স্বামীর শরীরকে কখন ভাল বাসিতে হয় না। তাহার ভিতরে যে পরমাত্মা আছেন তাহাকেই

ভালবাস। তাহা হইলেই কোন প্রকারের সেবার ত্রুটী হইবে না এবং কাম গন্ধ সেখানে আসিতে পারিবে না। যে স্ত্রী স্বামীকে শরীরের কামনা নিয়া ভালবাসে তাহাতে পতিব্রতা ধর্ম্ম হয় না, কিন্তু যদি ভগবান জ্ঞানে তাহার সেবা যত্ন করে, তাহা হইলে উভয়েরই মঙ্গল হয়। তাহাতে স্বামীর আয়ু বৃদ্ধি হয়। দুই একটী সন্তান হইলে মাতা-পুত্রের মত সংসার করিতে হয়। আর যদি কেহ বিবাহ কাল হইতেই ভাই ভগিনীর মত থাকিতে পারে, তার চেয়ে উত্তম আর নাই। সাধক ছাড়া এসমস্ত হয় না। তবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে মানুষ হইয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, ইহার চেষ্টা সর্ব্বদা করা উচিত। মানুষ হইয়া পশুর মত কতকগুলি খাইলাম আর কতক্ষণ ঘুমাইলাম, আর যখন ইন্দ্রিয়াসক্ত হইলাম তখন ভোগ করিলাম। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় যত বাড়াও ততই হয়। এই সমস্ত হুঁস করিয়া চলিতে হইবে। দেখ, সংসারে আসিয়া কি করিলে বল দেখি। কেবল শুধু শুধু খাটুনি। কেহ বা নিজের পরিবারের দাস আর কেহ বা স্বামীর দাসী, কিন্তু স্বামীর দাসী যে হইলে তাহাও নিস্বার্থ ভাবে হইলে না, তাহার কাছে স্বার্থ নিয়া রহিলে। যদি তাকে ভগবান বলিয়া ভাল বাসিতে, তাহা হইলে হইত স্বামীর সেবা। সর্ব্বদা মনে ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখার চেষ্টা কর। মা এই বলিয়া একটী গান ধরিলেন,

গান

আসিয়া ভুবন মাঝে হরিনাম যে না করিলি,
বৃথা কাজে মন মজায়ে সুধা সিন্ধু না দেখিলি।
গরলের রাশি ভরা তাহাতে যে ডুব দিলি,
আপনারে হারাইয়া সংসারে যে মজে গেলি।
অসার সংসার নিয়া সত্য বস্তু হারাইলি,
সত্য ধন নারায়ণ তাহারে ত না চিনিলি।
পরের প্রেমিক হয়ে আপন প্রেম না করিলি,
শমন যায় অতি দূরে সেই হরির নাম না করিলি।
আছে সুধা সিন্ধু নদী গুরুর চরণ তলে,
ডুবে থাক মন, তোরে বলি অতিব কৌশলে।

গানের পর মা বলিলেন, 'দেখ, ঠাকুরের নামই সত্য। ঠাকুর ছাড়া আর কিছু নাই'।

(১২)

মায়ের কায়াতে সর্ব্বদা ওঁকার ও বিষ্ণু চরণ শোভা পাইত। যাঁদের সৌভাগ্য তাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, ভাগ্যহীনদের দর্শন ঘটে নাই। মায়ের কায়া হইতে অনেকেই বীজমন্ত্র পাইয়াছে। মায়ের যে কি লীলা তাহা বর্ণিতে পারি না।

মায়ের কাশীধামে আসিয়াই সাধনার উচ্চ অবস্থা হয়। স্তরে স্তরে নানা রকম দর্শন পান। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন। অনাহত ধ্বনি হইতে থাকে। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর,

অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারে সমস্ত পদ্ম বিকশিত হইয়া মায়ের দর্শন হইতে লাগিল। কত নদনদী, পর্ব্বত, সপ্তলোক, সপ্ত সমুদ্র সব দর্শন হইয়া সহস্রার উপর মহামিলন হইয়া গেল। মহাশূন্য, ব্রহ্মপদ কত রকম যে হইয়াছে তাহা আমরা বর্ণনা করিতে পারি না। আমাদের সব বলিতেন না। মা অনেক রকম জ্যোতি দর্শন করিয়াছেন। ওঁকারের সহিত নারায়ণ মায়ের কাছে সর্ব্বদাই দাড়াইয়া থাকিতেন। মা তাহা সর্ব্বদা দেখিয়া উৎপল-নয়নী হইয়া থাকিতেন। এজন্য বাহিরের বস্তু মায়ের দৃষ্টিগোচর হইত না। কেহ কেহ বলিত, মা চোখে দেখিতে পান না। মা বলিতেন যে আমি বক্রদৃষ্টিদ্বারা তোমাদের দেখি। সোজা নয়নে তোমাদের দেখিতে পাই না। কাশীধামে খালিসপুরা হইতে মা যখন ১২০নং হারাড় বাগের বাড়ীতে আসিলেন তখন মায়ের খুব বেশী দর্শন হইতে লাগিল। তিন বৎসর পর্য্যন্ত মায়ের ব্রজলীলা দর্শন হয়। তখন মায়ের কায়া ভেদ করিয়া অনেক বাণী বাহির হইল। এখানে আসিবার পূর্ব্বেও মায়ের কায়াভেদী বাণী বাহির হইত। মায়ের একজন ভক্ত সেই বাণীর কতক অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিল। তাহাতে অদ্ভুত কথা আছে।*

কাশীধামে খালিসপুরা ও অন্যান্য বাড়ীতে মায়ের ব্রজলীলা দর্শন হইতেছিল, সেই সময় মায়ের কায়াভেদ করিয়া বাণী বাহির হইয়াছিল। সেই সময় এক ভক্ত বালক বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করিতে লাগিল। যখন মা হারাড়বাগের বাড়ীতে আসেন তখনও

* মায়ের কায়াভেদী বাণী এই গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইল।

মায়ের লীলা দর্শন খুব বেশী চলিতেছিল। এখানে আসিয়াই কায়াভেদী বাণী সমাপ্ত হইল অর্থাৎ সেই ভক্তটি চলিয়া গেল।

মায়ের অনেক কায়াভেদী বাণী বাহির হইয়াছে, সে সময় সব লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এসব লিখি নাই। মায়ের শেষ সময় পর্য্যন্ত মায়ের অঙ্গে অনর্গল বাণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন কাগজের উপর ছাপার অক্ষর টাইপ করার মত উঠে, তেমনি মায়ের অঙ্গে অক্ষরগুলি উঠিত। সেই ভক্তটি এখানে কিছু বাণী লিখিয়াছিল, তাহা সে কাহাকেও দেয় নাই। এই পুস্তকের শেষে যে কায়াভেদী বাণী দেওয়া হইল তাহার অধিকাংশ খালিসপুরার বাড়ীতে উঠিয়াছিল, বাকী অংশ অন্য জায়গায়।

মা আমাদিগকে বলিতেন যে চঞ্চল মন নিয়া থাকিও না। এখন মন স্থির কর। শান্ত প্রকৃতি হও, সর্ব্বদা নিজের মনে বিবেক আন। দেখ, এতদিন যে সংসার করিলে তাহাতে কি কিছু সুখ পাইয়াছ? সংসারে কেবলই বিষের জ্বালা ঐ ছেলেমেয়েগুলি নিয়া। তাহাদেরে লালন-পালন কর, মেয়ে বড় হইলে তার বিয়ের জন্য ভাবনায় অস্থির। রাতদিন সেই ভাবনায় ঘুম হয় না। কেবল বৃথা ভাবনা। তার দশ অংশের এক অংশও যদি ঠাকুরের জন্য ভাবিতে, তাহা হইলে কত উপকার হইত বল দেখি। তোমাদের কি সে সমস্ত জ্ঞান আছে? আমার কাছে আসিয়া কেহ বলে যে মা, আশীর্ব্বাদ করুন; আমার মেয়েটীর বিয়ে হউক। কেহ বলে যে আমার ছেলেটী পাস করুক। কেহ বলে যে আমার কতকগুলি ঋণ আছে শোধ হউক। কেহ বলে যে আমার শরীর

অসুস্থ, মা, আপনি বলুন, ভাল হউক। আমি তখন মনে মনে হাসি, ভাবি, ঠাকুর! এসব কি জঞ্জাল পাঠাইয়া দিয়াছ? ওরে, দেহ ধারণ করিতে গেলে রোগও হয় শোকও হয়। সে সমস্ত বৃথা কথা আমার কাছে নিয়ে আস কেন বাপু? আমি ত কোন সিদ্ধাই বুদ্ধাই জানি না। মা এই কথা মুখে বলিতেন বটে, কিন্তু মায়ের কাছে নিবেদন করাতে তাহাদের ফল ভালই ফলিত। মা কিছু বলিতেন না, সকল সময় যেখানে বসিতেন নিজেই ভাবে মগ্ন থাকিতেন, অথচ কেউ গেলে তার সঙ্গে দুচারটি ব্যবহারিক বা পরমার্থিক কথাও কহিতেন। কেহ লৌকিক প্রার্থনা করিলে মা ভাল মন্দ কিছুই বলিতেন না, কেবল জানালার দিকে তাকাইয়া চুপে চুপে শুনিয়া যাইতেন, কোন জবাব দিতেন না। চোখ বুজিয়া বসিয়া বসিয়া দুলিতেন।

অনেক দিন আগে যখন মা খালিসপুরার বাড়ীতে ছিলেন তখন মা একদিন অন্নপূর্ণার বাড়ীতে দর্শন করিতে গিয়াছেন। মা ধ্যানে বসিয়া আছেন নাট-মন্দিরে। তখন অন্নপূর্ণা মাকে ডাকিতেছেন, 'আয়, ঘরে আয়'। মা তখন ঘরে গেলেন। তখন মা অন্নপূর্ণা নিজের হাতে অনেকগুলি সোণা-রূপা মণি-মাণিক্য নিয়া মাকে বলিলেন 'এই সব নে'। মা বলিলেন, আমি ওসব নেব না। আমার ওসবে দরকার কি? অন্নপূর্ণা কিছুতেই ছাড়েন না। মা যে দিকে ঘুরিয়া যান, উনিও সে দিকে গিয়া বলেন, "নে, নে।" মা তখন বলিলেন আমি কি বিপদে পড়িলাম? মা তখন অন্নপূর্ণার কাছে কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন "আমি এই সমস্ত

নিব না, মা, আমায় ছলনা করিও না।" আর চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে পাণ্ডারা ত দেখিতে পাইল না। এরকম মায়ের কত রকম ঘটনা হইয়াছে। আর একদিন বিশ্বনাথের বাড়ীতে মা বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন সাধু সুবর্ণের কৌটা হাতে করিয়া মাকে বলিলেন, "এই নাও"। তখম মা বলিলেন, 'কি আছে ওর ভিতরে?' তখন তিনি কৌটা খুলিয়া দেখাইলেন একটি শিব লিঙ্গ আর নারায়ণ চক্র, খুব জ্যোতির্ম্ময়। মা কতক দূর বাড়ীর দিকে নিয়া আসিয়া ভাবিলেন কোথায় নিয়া যাব, আবার কে কি বলিবে? তখন মা আবার ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন সেই জটাওয়ালা সাধু দাড়াইয়া আছেন। সে সাধু মাকে দেখিয়া বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়াছ, তবে দাও। আমি বিশ্বনাথ, আমার রূপ দেখিবে? তখন মাকে বিশ্বনাথ দর্শন দিলেন। জটা-জুটধারী, মাথায় ফণি, বিভুতি সর্ব্বাঙ্গে, ব্যাঘ্রাম্বর পরিধানে, পায়ে রজতের খড়ম, একহাতে ত্রিশূল আর এক হাতে ডমরু। মা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মা আর ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারেন না। সন্ধ্যা হইল। তখন বিশ্বনাথ বলিলেন, "যা, যা, বাড়ী যা"। তখন মা আস্তে আস্তে বাড়ী আসিলেন। আসিয়া আমাদের পিতার কাছে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। পিতা বলিলেন যে এমন জিনিষ কি ছাড়িতে হয়? কেন আনিলে না? মা বলিলেন, কি জানি ঠাকুরের ইচ্ছা। ঠাকুর যা করান তাহাই হয়। আমার কি কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে? এই রকম কত কি হইত। আমরা কি বর্ণনা করিতে পারি?

(১৩)

খেতে শুতে সর্ব্বদাই ভাবাবিষ্ট মনে,
উৎপল নয়নে মাতা থাকিতেন ধ্যানে।
কাঞ্চন পরশে তাঁর হাত বাঁকা হ'ত,
সেই হেতু তিনি তাহা স্পর্শ না করিত।
লেখা পড়া জানিতেন মা ভুলিলেন সব,
সর্ব্বদাই বলিতেন মূলই কেশব।
অসার যে লেখা পড়া মনে নাই আর,
গোবিন্দ আছেন মোর সংসারের সার।
সকল জানিয়া জীব চিনে না তাহারে,
গোবিন্দ কেশব সদা থাকেন যে ঘরে।
সেই ঘরখানি তোরা পরিষ্কার করি,
যতনেতে ডাকতে হয় গোবিন্দ শ্রীহরি।
চঞ্চল হইলে চিত্ত নাম কর জোরে,
সুস্থির হইবে চিত্ত বলি যে সবারে।
কত রকম আছে জ্যোতি কত মনোহর,
দেখিতে পাইবে তারে একনিষ্ঠা কর।
দাস্যভাবে সখ্যভাবে মিনতি করিবে,
বাৎসল্য ভাবেতে সদা ডুবিয়া থাকিবে।
বাৎসল্য ভাবেতে হয় গোপাল সেবন,
প্রেম উথলিয়া যায় ভাবেতে মগন।

নিজের অন্তরে সদা ভাবাবেশ ধরি,
সেবন করিবে সদা গোবিন্দ শ্রীহরি।
কিন্তু যেন ভাবাবেশে লোকের নিকটে,
প্রকাশিয়া নাহি দিবে কহি অকপটে।
ভাবের মত্ততা সদা গোপনে রাখিবে,
লোকের নিকট তাহা নাহি প্রকাশিবে।
ইষ্ট বস্তু হয় বড় গোপনের ধন,
সেজন্যে বাহিরে কিছু নহে প্রকাশন।
যতনে সতত তারে আদরে রাখিবে,
ভক্তিভাবে একাসনে সাধন করিবে।

মা এ সকল উপদেশ ভক্তদের দিতেন। মায়ের এমন সুন্দর মধুর কথা! এই সকল শুনিয়া আমাদের মন বাহির থেকে অন্তর্মুখী হইত কিছুক্ষণের জন্য। মায়ের কাছে গেলে আমরা সকলেই শান্তি পাইতাম। ভগবানের কথা ছাড়া মায়ের ওখানে আর কোন কথা ভাল লাগিত না। মা আমাদের মন তুষ্টির জন্য দুই একটী বাজে কথাও বলিতেন। তখন আমরা ভাবতাম মা আর এ সমস্ত বলেন কেন? মা তখন আমাদের মনের ভাব বুঝিয়া বলিতেন, তোমরা ত সংসারের কথাই ভালবাস। সেজন্য তোমাদের সঙ্গে দু-একটা আজে বাজে কথা বলি। তখন কেহ বলিত, মা, আপনার কাছে আসিয়াছি ভাল কথা শুনিবার জন্য। তখন মা বলিতেন, 'তাই নাকি'? তখন মা যত ভাল ভাল উপদেশ বলিতেন। বলিতেন, সংসারে বিরক্তিভাব রাখিবে। এ সংসারটা

ত কিছু নয়, এটা হইল মাটির বাসন। দেখ, দেহ খাঁচাটা স্থায়ী নয় অস্থায়ী, তার জন্য মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা করিতে হয় না। যাহাতে ভগবানের পথে চলিতে পার সেই চেষ্টাই কর। যখন ভবে আসিয়াছ তখন কাহাকেও সঙ্গে নিয়া আস নাই এবং সঙ্গে নিয়া যাইবেও না। পাপ পুণ্য দুইটিই সঙ্গে যাইবে। এইখানে যেরূপ রাজার বিচার হয়, সেরূপ সেখানকার রাজার বড় কঠোর বিচার। সেখানেও মুনসেফ্ কোর্ট, জজ কোর্ট সবই আছে। সে জন্যই নিজেকে নিজে বুঝিয়া চলিতে হয়। সেই যে ভগবান, তাঁহার রাজত্বে গিয়া যেন আর কাহারও হাতে না পড়িতে হয়। তিনিই যেন চরণে করিয়া তুলিয়া লন এই চেষ্টা করিবে। মনের মধ্যে সর্ব্বদাই বিবেক রাখিবে। দেখ, যখন আসিয়াছ তখন একদিন যাইতেই হইবে।

সুখ আর দুঃখ দেহ ধারণেই হয়। সুখে বেশী আনন্দ নিতে নাই এবং দুঃখে বেশী দুঃখীও হইতে নাই। সমভাব নিয়া থাকাই উচিত। এই দেহটা ত থাকিবে না, দেহটা ত রক্ত পূঁজ ভরা, তাহার মধ্যে যে ভাল জিনিষ আছে তাহার সন্ধান কর। সেই যে পরমাত্মা তোমার দেহে ভিতর আছেন। তুমি অচৈতন্য আছ বলিয়া সেই সচৈতন্যকে দেখিতে পাওনা এবং তাঁহার কোন সাড়া শব্দও পাওনা। যদি তাঁহাকে জাগাইতে চাও, তাহা হইলে আপনি জাগ। দেহের মধ্যে অনেক রিপুর কারখানা আছে। সেই কারখানাগুলি যাহাতে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা এই যে সর্ব্বদা ভগবানের নাম কীর্ত্তন, তাঁহার

ধ্যান, গুরুর চরণে শরণ নেওয়া, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া। দেখ, ঠাকুরের দুয়ারে ভিক্ষা করিতে হয়। সে দুয়ারে যাওয়া বড় কঠিন। সেজন্য দুয়ারে যে অষ্টপ্রহরী আছে তাহাদের আগে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট করিতে হয়। যিনি আদ্যাশক্তি ভগবতী তাঁহার শরণ লইতে হয়। তিনি ছাড়া শক্তিদাতা কেহ নাই। শক্তি বিনা ভক্তি হয় না। সর্ব্বদা সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করিবে।

পরে মাকে ঠাকুর বলিলেন, তুমি কীর্ত্তন গাও, আমি শুনি। তাহাতে মা কিছুদিন ঘরের কোনে বসিয়া কীর্ত্তন গাইতেন। খুব সুন্দর কীর্ত্তন হইত। কত ভক্তেরাও শুনিয়াছে। মায়ের অঙ্গে কত রকম জ্যোতির প্রকাশ হইত। চরণ দুইখানি যেন লাল টুকটুকে ছিল। মায়ের হস্ত কোন সময় সাদা আবার কোন সময় মনে হইত হাত দুখানি লাল টুকটুক করিতেছে। মায়ের ললাটে শ্বেতবর্ণ জ্যোতি দেখা যাইত ওঁকারের সহিত। ওঁকারের সহিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিও দেখা যাইত, কখন পাদপদ্মও দেখা যাইত। আবার মা যখন রাত্রে বসিয়া কিম্বা শুইয়া থাকিতেন তখন মনে হইত মায়ের গায়ে বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে। আমরা ভাবিতাম ঘরে কোন রকম আলো আসিয়াছে, সেজন্য এ রকম দেখা যাইতেছে। তখন আমরা সব জানালা পর্দ্দা দিয়া বন্ধ করিতাম। ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিতাম। তখন দেখা যাইত আরও উজ্জ্বল ভাবে বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে, আর চারিদিক হইতে শ্বেতবর্ণ জ্যোতি বাহির হইতেছে। মায়ের কোন ভক্ত দেখিতে পাইত যে মায়ের গায়ের

উপর গোপাল খেলা করিতেছে। এক একবার মায়ের স্তন পান করিতেছে। কোন সময় বা মায়ের কোলে অথবা কাঁধে উঠিতেছে, কোন সময় বা মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে। তখন সেই ভক্ত মাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা কি সত্য? মা বলিলেন, যাহা দেখিতেছ তাহা ঠিকই, আমিও দেখিতেছি। তোমাকে বাৎসল্য প্রেম শিখাইতেছেন। মা বলিলেন, ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা, তাহাত কেহ বুঝে না এবং বিশ্বাসও করে না।

গান

ঠাকুরের অপার লীলা বুঝিতে না পারি,
হাসিখেলা করে সবে মায়ায় গড়াগড়ি।
কেহ হাসে কেহ কাঁদে কেহ নাচে গায়,
হরি নামের নামাবলী ধরে না ত কায়।
অপার লীলা হয় তাঁর সুন্দর মূরতি,
ত্রিভঙ্গিম ঠামে ভক্তের হৃদয়ে বসতি।
ভক্তজন তাঁহার কাছে আদরের ধন,
শূন্যমন করে, এখন ভজ নারায়ণ।
তুফানে ভয় পেওনা রাখবেন শ্রীহরি,
তুফানে ভয় পেওনা রাখবেন মুরারী।

(১৪)

আত্মদর্শনের যে কি অনন্তলীলা যাহারা অনুভব করিয়াছে তাহারাই জানে। প্রথম সোপানে সাধকের গণেশ দর্শন হয়, গণেশ হইতেছেন সিদ্ধিদাতা। গণেশের কৃপায় সাধকের

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হন। সেই আদ্যাশক্তির কৃপায় মন তাঁহার চরণে ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া যায়। অনাহতের ধ্বনি হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি যখন জাগ্রত হন তখন কেহ দেখে যে সর্পাকারে কুণ্ডলিনী বলয় পাকাইয়া আছে, তখন আস্তে আস্তে ছাড়িতে থাকে, যেমন পদ্মের নাল থাকে, তেমনি এক নাল হইয়া সেই সর্পটী মণিপুর আদি চক্রভেদ করিয়া সহস্রায় উঠে। আবার কোন কোন সাধক দেখিতে পায় যে এক শক্তি মূর্ত্তি ত্রিনয়নী শয়ন করিয়া আছেন নাভিচক্রে। তখন তিনি উঠিয়া বসিয়া ভক্তকে বলেন, 'তুমি কি চাও'? তখন ভক্ত যদি কোন সিদ্ধাই চায় তাহাও পায়। কিন্তু খাঁটি ভক্ত কখনও সিদ্ধাই চায় না, সে বলে, 'মা আমাকে উদ্ধার করিয়া লও'। তখন কুলকুণ্ডলিনী শক্তি তাহাকে হাতে ধরিয়া আস্তে আস্তে সমস্ত চক্র ভেদ করিয়া সুন্দর দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে সহস্রায় লইয়া গিয়া মহামিলন দর্শন করান। যে দর্শন করিয়াছে সেই জানিতে পারে। সহস্রারে খুব উজ্জ্বল জ্যোতি এবং সহস্র দলে সহস্রবাতি, তাহার ভিতর পূর্ণ কুম্ভ থাকে। এইরূপ প্রত্যেক চক্রেই যে যে চক্রের যে বাহার সব দেখা যায়। সহস্র দলে স্বর্ণময় সিংহাসন, তাহাতে শিবশক্তি বিরাজ করেন। আমি দেখিয়াছি তাহার কাছে এক পা সর্প রহিয়াছে এবং ত্রিনয়নী শক্তিও আমার সঙ্গে সঙ্গে পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছেন। আবার সময় সময় যুগল মূর্ত্তিও দেখা যায়। সেই সব চক্রের দর্শন আমার খুব ভাল রকমই হইয়াছে, তাহা তোমাদের কাছে বিশেষ কি বর্ণনা করিব। সাধন করিতে

থাক সকলই দেখিতে পাবে। অষ্টভুজা, চতুর্ভুজা, দশভুজা, শতসহস্রভুজা শক্তি দেখা যায়। ভগবানের বিরাট রূপ দর্শন হয়। সাধকের কাছে কোনরূপ দর্শনের অভাব ঘটে না। সেজন্য যে সাধক সত্যভাবে দর্শন করিয়াছে তাহার মন স্থির হইয়া যায়। তাহার বাহিরের দর্শনের জন্য স্পৃহা থাকে না। সে নিজে নিজেই আপনার দর্শনে আপনি ভুলিয়া থাকে। তার বাহিরে কিছুই ভাল লাগে না। ছবির মত দর্শনেতে কিছুই হয় না। আত্মদর্শন করা চাই। আত্মদর্শনের প্রথম ভাগে মূল হইতে একটি কাঁচের ফানুষের মত উঠে, ক্রমে সেইটি উঠিতে উঠিতে সব চক্র ভেদ করিয়া সহস্রায় যায়। সেইটি ক্রমান্বয়ে রূপ পরিবর্ত্তন করে, তারপর মুখের আকার দেখা যায়, তাহার চারিদিকে জ্যোতি বাহির হয়। প্রথমে লাল, পরে হরিদ্রা, নীল, শেষটায় শ্বেতবর্ণ জ্যোতি। তাহার পর অনেক রকম জ্যোতি হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সাধকের মনে তখন খুব স্ফূর্ত্তি আসে। দেখ, তোমাদের বলিতেছি বাহিরে ছুটাছুটি আর করিও না। ভিতরে সন্ধান কর দেখ কত সুন্দর অমূল্য জিনিষ আছে। এরকম ভাবে সাধন করিতে করিতে তবে ত সমস্ত দেখিতে পাইবে। কত রকমের যে দর্শন হয় তাহা তোমাদের কি বলিব? তোমরা কি তাহা প্রত্যয় কর? সামান্য দর্শনের কথা বলিলাম। ঠাকুর আমাকে সব দেখাইয়াছেন। আমি তোমাদের কাছে সব বলিতে পারি না, কারণ বলিলে যদি কেহ বিশ্বাস না করে তাহার ক্ষতি হয় এবং সাধকেরও ক্ষতি আছে। আমাকে ঠাকুর স্তরে স্তরে সব দেখাইয়া যখন

যেভাবে সাধন করিতে হইবে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি কুল গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়াছিলাম। তাহাই ধরিয়া বসিয়া ছিলাম। সেই শক্তির জোরে আমি শক্তিমানকে পাইয়াছি। শক্তিমান আমাকে সমস্ত শক্তি দিয়া সাধন করাইয়া লইয়াছেন। ঠাকুর যদি কৃপা না করিতেন, তাহা হইলে কি আমার সাধনার সিদ্ধি হইত? যখন যে ভাবের সাধনা সেরূপ আমাকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। যখন সহস্রার ভেদ হইয়া শূন্য, মহাশূন্য, ব্রহ্মপদ ও পরমপদ দর্শন হয় তখন ইহ জগতের কোন কথাই মনে থাকে না। মন সর্ব্বদা শূন্য থাকে। ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা দেহ দগ্ধ হয়। অঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ছাই ভস্ম যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ চিত্ত স্থির হয় না। যখন প্রেমের তুফান বহিয়া যায় তখন সেই হাওয়াতে সমস্ত ছাই উড়িয়া যায়। এই সব দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারে, তাহা না হইলে উপহাস মাত্র। শাস্ত্রকারেরা কিছু জানিতে পারেন। এত স্থূল জগতের কথা নয়, এ হইল সূক্ষ্ম জগতের কথা। সূক্ষ্ম শরীরে এ সমস্ত হইয়া থাকে। জীবের মায়ামোহ থাকিতে প্রকৃতরূপে এসব দর্শন হয় না। আমার যখন এ সমস্ত দর্শনের এক একটা দর্শন হইতে লাগিল, তখন আমি ভাবিতাম এই বুঝি শেষ। তখন ঠাকুর হাসিয়া বলিতেন, "আরও আছে, আরও আছে।" কত রকম যে রিপুর যন্ত্রনা হয় তাহা যে সাধন করিয়াছে সেই বুঝিতে পারে। রিপুরা সহস্রার পর্য্যন্ত থাকে। পরে দেখা যায় যে রিপুরা বোঝা নিয়া নিয়া মানুষ আকারে কুৎসিতরূপে চলিয়া

যাইতেছে। এরূপে রিপুরা চলিয়া গেলে পরে সাধকের কিছু শান্তি আসে। রিপুরা যখন ভয় দেখায় তখন সাধকের মন ক্ষিপ্ত হয়। আমি তখন ঠাকুরকে বলিতাম, 'ঠাকুর, আর ত পারি না'। তখন ঠাকুর আমায় অভয়দান করিতেন, "ভয় নাই, আমি আছি"। একদিন একটা রিপু আসিয়া আমাকে মারিবার জন্য উপদ্রব করিতে লাগিল। আমি তখন ঠাকুরকে বলিলাম, "ঠাকুর, দেখ আমায় কি করিতেছে?" তখন ঠাকুর আমায় বলিলেন, "যাচ্ছি"। ঠাকুর তখন তাহাকে মারিবার জন্য চক্র লইয়া তাহার পিছনে পিছনে ছুটিলেন। আমি তখন ঠাকুরের পায়ে ধরিয়া বলিলাম, "মারিয়া ফেলিও না, মারিয়া ফেলিও না, আমার যে কষ্ট হইতেছে।" তখন ঠাকুর বলিলেন যে, তোমাকে আবার মারিবে। আমি বলিলাম, "তাহাও যেন না হয়, উহাকে তাড়াইয়া দাও।" এই রকম ভাবে কত উৎপাত আসে। সাধককে খুব সাবধানে থাকিতে হয়।

গান

থাক বিজন কাননে, আপনার মনে, ডাকিও গোবিন্দ ধনে।
রাখিও যতনে, শান্তি নিকেতনে, সেই শ্রীমধুসূদনে।
দেহ বন করি, দিবস শর্ব্বরী, বসাইও ফুল বন তাতে।
মালঞ্চর মাঝারে, সিংহাসন করে, বসাবে গোবিন্দ ধনে।
মনেতে তুলসী করিয়া চরণ, ভক্তি চন্দন তাতে ঘসিয়ে সঘন।
দিও শ্রীচরণে করি অর্পণ আপনার দেহমন তাতে।

(১৫)

মনের পূর্ণ বিকাশ হইলে আত্মদর্শন হয়। আত্মা পরমাত্মার যোগই ভগবানের সঙ্গে মিলন। নিজের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান থাকে না তখন দেখা যায় যে সমস্তই ভগবানের অঙ্গ। মনে কোনরূপ দুশ্চিন্তা আসে না। এ স্থূল দেহেই দেখা যায় যে আমার কিছু নাই এ অঙ্গ যে ভগবানের। সেইজন্য সাধক যখন সিদ্ধ হয়, তখন ভগবানের দেহ বলিয়া কিছু যত্ন আসে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের সাধনা চলে ততক্ষণ দেহজ্ঞান রাখিতে নাই। সাধকের দেহের দিকে দৃষ্টি গেলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। সেই জন্য একমনে নিজের ইষ্টদেবতাকে ডাকিতে হইবে। গুরু আর ইষ্ট এক। গুরুর চরণ সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। মনের মধ্যে কোন গোলমাল রাখিতে নাই। মনকে সর্ব্বদা জলের মত রাখিতে হইবে। সাধকের মনে কখন দুষ্টবুদ্ধি আসে না। ভগবানের কাছে যদি যাইতে চাও পথের কণ্টক রাখিওনা। পথের কণ্টক হইতেছে গৃহস্থের আত্মীয় বন্ধু। সেইজন্য তাহাদের সঙ্গ হইতে সর্ব্বদা পৃথক ভাবে থাকিবে। তাহাদের ভালবাসায় ভুলিয়া যাইও না। যেরূপ সাপ খোলস ছাড়িয়া দেয়, আর সে খোলসের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেরূপ সংসার ত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্বদা একাগ্র মনে ভগবানের নাম ও ধ্যান করিবে। পথের সম্বল সেই নাম। সেই গোবিন্দই সার আর সমস্ত জিনিষই অসার। সাধন করিবার সময় খুব সতর্ক হইতে হয়। পূর্ব্ব স্মৃতি সব ভুলিয়া যাইতে হয়। তোমরা বলিতেছ যে কি করিয়া ভুলিব, মা? কেন ভুলা যাইবে

না? যে নিজের আত্মীয় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া পরকে নিয়া সংসার করিতেছ। সর্ব্বদা সংসারের পীড়নে মন ক্ষিপ্ত। বিষের জ্বালায় গায়ের জ্বালা। তিনি যে পরম সুহৃদ্ তাহাকি তোমরা বুঝিতে পার না? সর্ব্বদাই তোমাদের শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতেও ত তোমাদের লজ্জা নাই। যার জন্য তোমরা এত জীবন পাত করিতেছ সে ব্যক্তির যদি একটু ত্রুটি হয় তবে সে কত লাঞ্ছনা দেয়, তবু তাহাকেই তোমরা ভালবাস।

তাহার দশ অংশের এক অংশও যদি ভগবানের জন্য মায়া হইত, তাহা হইলে তিনি চতুর্গুণ ভাল বাসিতেন। আমি এসব অনুভব করিয়াছি। তাঁহার অসীম ভালবাসা পাইয়াছি।

যখন মহামিলন হয় তখন দেখা যায় যে একবারে বস্ত্রহীন ঠাকুরের সঙ্গে এক অঙ্গ হইয়া যায়। ঠাকুরের আর নিজের অঙ্গে কোন ভেদ থাকে না। সেই খানে মধুর ভাব। ভক্তিভাবে নিজের দেহ পুলকিত হয়। বাহিরের কোন জ্ঞানই থাকে না। আমি যে কে তাহা মনে থাকে না। তখন পরম বৈরাগ্য এবং বিবেক মনে আশ্রয় লয়। সেই পরম পুরুষের অঙ্গ স্পর্শে অঙ্গ পুলকিত হইয়া আনন্দাশ্রু ধারা বর্ষণ হইতে থাকে। তখন ঠাকুরের কাছে ভক্ত নিবেদন করে 'প্রভু তুমি যে আমার' এতদিনে জানিতে পারিলাম।

এই দেহ তুমি লইলে হরি,
আমার বলিতে রহিল না অরি।
পুলকে অঙ্গ আকুল করি,
সিক্ত করি নয়ন বারি।

সংসার হইতে উঠাইলে মোরে,
ধরিয়া আপন যুগল করে।
তব অঙ্কে হরি বসাইলে মোরে,
তুমি যে আমায় করুণা করে।
ঠাকুর বলিল, কিবা ভয় আছে ?
ভকতে রাখি সদাই কাছে।
যতনে তোমার নামটী রাখিব,
সিদ্ধিমাতা বলি খ্যাতি করিব।
জগত সংসারে সার বুঝিয়া,
লয়েছ চরণ আমার ধরিয়া।
আমিও তোমার চরণ ধরিব,
ভকত চরণ হৃদয়ে রাখিব।
মনের মানসে পূজেছ আমারে,
সিদ্ধিমাতা তুমি এই ত সংসারে
তোমার অঙ্গেতে আমার অঙ্গ,
ফুটাইব অঙ্গে কত প্রসঙ্গ।
বীজ মন্ত্র নাম অঙ্গেতে ফুটিবে,
সৌভাগ্য হইলে দেখিতে পাইবে।
মম চরণ তব অঙ্গেতে রহিবে,
ভক্তজন তাহা আদরে পূজিবে।
সার তত্ত্ব মোর শুন কাত্যায়নী,
নাম রস সুধা পেয়েছ আপনি।

আপন বলিয়া তুমি যে আমার,
সকল অঙ্গেতে চরণ ওঁকার।
দেখে ভক্ত কত সুখী হয় তাতে,
অভক্তের নয়ন পড়ে না তাহাতে।
যে দেখেছে মোর চরণ ওঁকার,
সফল জনম হইবে তাহার।
আমি তব দাস হই কাত্যায়নী,
নমস্তে নমস্তে তুমি মা ভবানী।
নারায়ণীরূপে তুমি মা আমার,
শঙ্করী ভবানী হওমা এবার
ভবরোগ মাতা হরণ করিতে,
লয়েছ জনম এই অবনীতে।
আসিয়াছ মাতা জগতে এবার,
সাধন শিখাতে জগত সংসার।
যে শিখিবে মাতা সাধন তোমার,
মঙ্গল হইবে তার অনিবার।
কহি মা পার্ব্বতী আমি গো তোমারে,
সাধন করিলে পর্ব্বত আকারে।
সাধন করিতে বসিতে যখন,
অশ্রু জলে সিক্ত করিতে চরণ।
আসিতাম আমি মুছাতে সলিল,
নিষেধ করিতে হইয়া ব্যাকুল।

প্রেম অশ্রু জলে ভাসাতে আমারে,
হারাইয়া মোরে সাধন সমরে।
সাধনে জিনিয়া সকল সময়,
গ্রহণ করিতে আমারই আশ্রয়।
চরণ তোমার মস্তকে রাখিয়া,
আশিষ করিতাম পুলকিত হইয়া।
তাই বলি মাতা তুমি সিদ্ধি দাতা,
করি তব সেবা তুমি জগত ত্রাতা।

এই রূপ করে মান বাড়াইয়া ঠাকুর বলিত মোরে,
মরি হায় হায় একি হ'ল দায় ঠাকুর কি করে আমারে!
বুঝি ছল করি যাইবে শ্রীহরি তাই বুঝি ছল কর,
মায়া না করিয়া আমায় ভুলাইয়া যেওনা হে মহেশ্বর।
পড়ি তব পায় ক্ষম হে আমায় দাস্যভাবে সেবা করি,
আমি দাসী তব ক্ষম হে মাধব ভক্ত বটে হই হরি।
সাধন সমরে জিনিতে তোমারে কে পারে এ সংসারে?
তোমার কৃপায় পেয়েছি তোমায় সকলি দিয়াছি তোমারে।

গান

তোমায় আপন করিতে ছিল মোর চিতে,
তাই হে সাধন করি।
তুমি এসেছ এসেছ হরি, আমার সকল আশা পূর্ণ করি।
আমার ছিল অশ্রুজল, পথেরই সম্বল রেখেছিনু যতন করি।
আমি রেখেছিনু তাই শ্রীহরি।

তাই চরণ ধুইয়ে, তোমায় ফুল দিয়ে, পূজি হে পূজি হে হরি।
আছে মালঞ্চ কানন, শুন নারায়ণ, আমার হৃদয় উপরি।
আমি তাই তোমায় পূজা করিহে হরি।

(১৬)

আপন মনে সর্ব্বদা থাকিবে। মনের চাঞ্চল্য হইলে বড় ক্ষতি হয়। যতক্ষণ গৃহস্থাশ্রমে থাকা হয় ততক্ষণ সৎসঙ্গ হয় না, কারণ গৃহস্থি নিয়া ভুলিয়া থাকে। তাহার ভিতর যদি কেহ বীর সাধক হয় তবে সেই ভগবানকে পাইতে পারে। গৃহস্থিতে থাকিয়া তাহাই নিয়া সর্ব্বদা ভুলিয়া থাকা উচিত নয়। ইহার ভিতর থাকিয়াও ভগবানের উপাসনা করা উচিত। এই গৃহস্থালী ত ভাঙ্গা ঘর। কখন ঝড় উঠিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে তাহার ত ঠিক নাই ; সেইজন্য তোমাদের বলিতেছি এই ছাইমাটী নিয়া আর থাকিও না। সেই যে পরম-পুরুষ ভগবান তাহার আরাধনা কর। অবিদ্যা নিয়া বেশীদিন থাকা উচিত নয়। বিদ্যার সন্ধান করিতে হয়। অবিদ্যা হইল মায়া, মোহ, ক্রোধ, অহঙ্কার, কাম, আত্মশ্লাঘা। আর বিদ্যা হইল সত্য পথে সন্ধান। বিদ্যা রাণী মায়া মোহ খণ্ডন করেন, ভক্তকে ভাল পথে নিয়া চলেন। বিদ্যা মানে সরস্বতী। বিদ্যা সন্তুষ্ট হইলে সত্য পথে সন্ধান হয়। দেখ, মায়া-মোহ নিয়া থাকিলে কিছুই হয় না। মায়ের আরাধনা কর যাহাতে অসার কামনা বাসনা লুপ্ত হইয়া যায়। এই যে পরাবিদ্যা পরাশক্তিমানের সঙ্গে এক হইয়া আছেন

তাহা চোখে দেখা যায়। পরাশক্তি হইলেন মহালক্ষ্মী, আর পরাশক্তিমান পুরুষ হইতেছেন মহাবিষ্ণু, উভয়েরই চতুর্ব্বাহু, সুন্দর রূপ, অতি উজ্জ্বল বর্ণ, ওঁকার শোভিত, চতুর্দ্দিক জ্যোতির্ম্ময়। যখন সাধকের সাধনা সিদ্ধি লাভ করে, তখন এসব রূপ দেখা যায়। কত মহানদ-নদী আছে সেসব সাধককে ভগবান নিজে পার করিয়া নিয়া যান। শ্বেতদ্বীপ, মানস-সরোবর, ভ্রমর-গুহা এই সমস্ত দর্শন হয়। ভক্তকে ঠাকুর মানস-সরোবরে স্নান করাইয়া নেন। সেখানে যুগল রূপে ঠাকুর হংসহংসী রূপে বিরাজ করিতেছেন। যতগুলি মায়াচক্র দেহের মধ্যে বিরাজ করে সেই সমস্ত ঠাকুর চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তকে উঠাইয়া নেন। ঠাকুরের অসীম কৃপা।

ইহা সাধনা না করিলে বুঝিতে পারা যায় না। তবে যাহারা কৃপাসিদ্ধ তাহাদের বেশী কষ্ট করিতে হয় না। গুরুর কৃপায় সে পার হইয়া যাইতে পারে। পরপারের বন্ধু ভগবান। সর্ব্বদা মনকে তাহার চরণে অর্পন করিবে। এই সমস্ত নিজের চোখে দেখিয়াছি। যখন ধ্যান করিতে বসিতাম, তখন দেখিতে পাইতাম ধ্বজা, পতাকা, চামর লইয়া ঠাকুর নিজের হাতে ব্যজন করিতেছেন। তখন ভাবিতাম এ আবার কি ? আমি বলিতাম, "ঠাকুর, তুমি আমাকে কেন ব্যজন করিতেছ ?" "ঠাকুর বলিতেন, তুমি যে আমার অঙ্গ। তোমার গা দিয়া দরদর করিয়া ঘাম পড়িতেছে, ইহাতে যে আমার কষ্ট হয়। ভক্তের কষ্ট আমি দেখিতে পারি না।" আমি বলিতাম, "ঠাকুর! আমার কোন কষ্ট নাই, আমি ত কোন

গরম বোধ করি না ?" ঠাকুর বলিতেন, "তোমার ত আর দেহজ্ঞান নাই, তুমি কষ্ট কি সুখ কিছুই বুঝ না। তোমার গায়ে যে কতগুলি মশা বসিয়াছে তাহাও ত তুমি বোধ কর না। তোমার আসনে কত যে ছারপোকা, তোমার নাভীতেও কত ছারপোকা বাস করিতেছে, তাহাও তুমি টের পাও না। তোমার দেহের ভিতর কামড়াইতেছে তাহাতে দেখ আমার গায়ে কেমন দাগ পড়িয়াছে। তোমার গা আর আমার গা যে এক। তাহা ত তুমি বুঝ না। তুমি আমাকে নিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়াছ।" আমি বলিতাম, "ঠাকুর! আমি কি করিব? তুমিই ত সব, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমি এসব মারিতে পারি না। আমার কষ্ট হয়।" ঠাকুর বলিলেন, "আমি তার ব্যবস্থা করিয়াছি।"

তখন আমরা দেখিতাম যে মায়ের বিছানায় ছারপোকা এত বেশী যে পিঁপড়ার সারির মত বিছানার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিছানার চাদর তুলিয়া মায়ের ভক্তেরা দেখিতেন যে ছারপোকা একেবারে থুক থুক করিতেছে। তখন মায়ের ভক্তেরা বিছানা রৌদ্রে দিত। মা বলিতেন, "থাক, উহারা আমাকে কামড়ায় না।"

তখন তাহারা বলিতেন, 'ওমা আমরা ত এসব দেখিতে পারি না, আপনাকে কামড়াক অথবা নাই কামড়াক। আমরা ত দেখিতে পাই যে ছারপোকা আপনাকে কামড়াইয়া বোলতার মত চাকা চাকা করিয়াছে।' তখন মা বলিতেন, 'তাই নাকি! কোথায় দেখি?' তখন তাহারা দেখাইয়া দিত, মা দেখিয়া

হাসিতেন। মা বলিতেন, "দেহজ্ঞান থাকিলে ত লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। আমি ত আর কিছু জানি না। আমি কেবল ঠাকুরকে নিয়াই থাকি। এই সব ছাই ভস্মের মধ্যে মন দিলে কি আর সাধনা হয়? সেই যে পরমগুরু ভগবান তাঁহার কাছে যখন মন যায় তখন এই সমস্ত ভুল হইয়া যায়। আমার ঘর, আমার কন্যা, বিছানা, মাদুর কিছুই মনে থাকে না। এমন কি, এই যে ঠাকুরের দেহটা তাহাকে যে আহার দিতে হইবে তাহাও মনে থাকে না। তবে দেহের দোষেতে পিপাসা আসে, একটু মাথাও ঘোরে। তখন ঠাকুরের নাম ও ধ্যান করিতে করিতে সেসব চলিয়া যায়। ভক্তের তৃষ্ণায় জল ও ক্ষুধায় অন্ন ভগবান। তাই সর্ব্বদা নাম করি। বংশীধারী শ্রীহরি আমার ভবরোগ—ক্ষুধা নিবারণ করিয়া রাতুল চরণ দিয়াছেন। আমি চাতক পাখীর মত তৃষ্ণায় আকুল ছিলাম, তাই কৃপাসিন্ধু কৃপাবারিবিন্দু দিয়া আমার তৃষ্ণা মিটাইয়াছেন। ভজন সাধন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণ লাভ করিয়াছি।"

সর্ব্বদা ঠাকুরের কাছে হা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। তাহা হইলে ঠাকুর কৃপাবারিদানে তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করেন। ঠাকুর ত……কথা নয়, যে অমনি বসিবে আর পাইয়া যাইবে। পথে ঘাটে ঠাকুর পড়িয়া নাই। তবে ভক্তের জন্য সব যায়গায়ই আছেন। সে সমস্ত যায়গায়ই ঠাকুরকে দেখিতে পায়। একজন বড়লোকের বাড়ীতে গেলে কত রকম সাজসজ্জা করিয়া যাইতে হয়, কিসে ভাল দেখাবে এবং কেমন করিয়া কথা বলিব তাহা মনে মনে কল্পনা করিতে হয়। কোন রকম ত্রুটি না হয় এই

ভাব নিয়া যাইতে হয়। তেমনি ভগবানের কাছে যাইতে হইলে আস্তে আস্তে অভ্যাস করিতে হইবে ত্যাগের, মন পবিত্র করিতে হয়। বেশভূষা পরিত্যাগ করিতে হয়। মনকে বৈরাগী বানাইতে হয়, বাহিরের বানান তো কিছু হয় না। অন্তরে বানাইতে হয়। তিনি অন্তর দেখিতে পান। বাহিরে বেশভূষা ত্যাগ করিয়া গায়ে কতগুলি ছাই ভস্ম মাখিয়া সাধু সাজিতে নাই। অন্তরে জ্ঞান অগ্নি জ্বালিয়া সমস্ত ছারখার করিয়া সেই ছাইভস্ম গায়ে মাখিবে। সর্ব্বদা প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিবে। বিবেক বৈরাগ্য আসিলে তবেই প্রেমাশ্রু আসে। তখন মনে আক্ষেপ হয় যে প্রতদিন আমি কি করিলাম। তখন সর্ব্বদার জন্য অনুতপ্ত হইয়া ভক্ত ভগবানের বিরহে কাতর হয়। কাতরতা না আসিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। সাধনের সময় ধৈর্য্য ধরিয়া সাধনা করিতে হয়। মেওয়া ফল শীঘ্র ফলে না। একটা কথা আছে যে সবুরে মেওয়া ফলে। সেজন্য তোমাদের বলিতেছি ভগবানের দিকে মন দাও। বিষয়কে বিষ জ্ঞান কর। যখন ভগবানের সাধনা করিবে তখন কামনা বাসনা মনে আনিবে না। যদি কেহ কামনা বাসনা নিয়ে সাধনা করে তাতে বেশী সুফল হয় না। ভগবান তাহাকে কিঞ্চিৎ মাত্রায় বিভূতি দান করেন, যেন তাহাতেই আনন্দিত হইয়া সে তাহার কামনা বাসনা পূর্ণ করে। দেখ, অনেকেই এই চায় যে আমার খুব নাম প্রচার হউক এবং আমার খুব আশ্রম হউক, সংসার জুড়িয়া খ্যাতি হউক। খুব ভক্ত জুটুক। আমি সকলের গুরু হইয়া বসি। আমার খুব মোটর, গাড়ী জুড়ি হউক। আমি

দেশ বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াই, খুব খ্যাতনামা সাধু। এসব ভাল জিনিষ নয়। সব দিক দিয়া ত্যাগ রাখাই উচিত। বেশী লোকজন জড় হইলে পর ঠাকুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়। ঠাকুর তখন মনে মনে হাসিয়া দূরে সরিয়া যান। ঠাকুর ত তাহাই চান। সাধককে এই প্রকার প্রবঞ্চনা করেন। যখন দেখেন যে এই সাধক কিছুতেই ভুলে না তখন তিনি বলেন যে তুমি ত বড় চালাক। তুমি ত আমাকে কিছুতেই ছাড়িলে না। আহা! তুমি আমার, আমি তোমার হইয়া গেলাম। সেই ঠাকুর কত রকম ঐশ্বর্য্য আমাকে দেখাইয়াছেন, আমাকে ভুলাইতে পারেন নাই।

আমি জগতে কাহাকেও চাই না। যদি বল যে তোমরা দু একজন আসিয়াছ সেইটা ঠাকুর আমাকে অনুনয় করিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া তাই তোমাদের কয়েকজনকে ঠাকুরের চরণে স্থান দিয়াছি। ভক্তের কখনই নাম প্রচারের ইচ্ছা হইবে না এবং ভক্ত মান্যগণ্য হইতে চাহিবে না। মান্যগণ্য হইতে গেলেই অপমান বোধ আসিবে। তাহা হইলে ঠাকুরের দিক হইতে দৃষ্টি কমিয়া যাইবে।

(১৭)

আস্তে আস্তে সাধন করিতে হয়। সাধন করিতে করিতে হৃদয়ের সমস্ত পর্দ্দা খুলিয়া যায়। আমি যখন সাধন করিতাম তখন প্রথম দৃশ্যে দেখিতে পাইতাম যেন ইষ্ট দেবতা ছবির মত সামনে দাড়াইতেন। তাহাতে আমার তৃপ্তি হইত না। তখন

খুব কাঁদিতাম, বলিতাম, "মা, এই যে তুমি দেখা দিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া যাইতেছ ইহাতে আমি তৃপ্তি পাই না। জননী মা, তুমি যে আমার আপনার মা তাহা আমি খুব বুঝিয়াছি। আমাকে তুমি মায়া মোহে ভুলাইতে পারিবে না। আমি তোমার স্বরূপ দেখিয়া ছাড়িব। এইসব ত ছায়ার মত দেখাইতেছে।" কিছু দিন এইভাবে থাকিতে হইল। পরে ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে পরদাগুলি সরিতে লাগিল। ভিতরে যে পর্দ্দা আছে তাহা দেখা যায়। যেমন বাহিরে ঠাকুরের ঘরে পর্দ্দা থাকে তেমনি এই ভিতরের ঘরেও পর্দ্দা আছে। পর্দ্দার আগে কপাট বন্ধ থাকে। সে কপাট গুরু কৃপা হইলে খুলে। আমাকে জগতের সেই কপাটের চাবি দিয়াছিলেন। এক গোছা চাবি দিয়া ঠাকুর আমায় বলিলেন যে চাবি নে, চাবি না হইলে ত কপাট খুলিতে পারবি না। তখন চাবি দিয়া কপাট খুলিলাম। ভিতরে অষ্ট দ্বার আছে। যেমন অষ্ট দল পদ্ম ভেদ হয় তেমনি অষ্ট দল দ্বারও ঠাকুর খুলিয়া দেন। দ্বার খুলিলে খুব সুন্দর দেখা যায়। এই সব হইল সূক্ষ্ম জগতের দর্শন। যাহারা এই সব দেখিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে, তাহা না হইলে ত উপহাস মাত্র। আমি সমস্ত দেখিয়াছি। এক এক ঘরে ঠাকুর এক এক রকম রূপ ধরেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতর সাদা না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্বেতরূপ দর্শন হয় না। প্রথম ভগবানকে কাল বর্ণই দেখা যায়। কোন সময় লাল বর্ণও দেখা যায়, কোন সময় হলদে বর্ণও দেখা যায়। তার পর নীলরূপ দেখা হয়, তার পর অল্প অল্প নীল, তার পরে উজ্জ্বল

জ্যোতির্ম্ময় দর্শন হয়, শ্বেত পদ্ম বিশিষ্ট, তাহাতে ওঁকারের আসন, উপরে মহাবিষ্ণু।

আমি ঠাকুরকে এইরূপ নানাভাবে দর্শন করিয়াছি। প্রথম অবস্থায় যখন ছবির মত দর্শন হইত তখন ব্যাকুলভাবে ঠাকুরের কাছে কান্নাকাটি করার পর মাকে বিরাটরূপে দর্শন করি। দশভূজা দুর্গা, কার্ত্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতীর সহিত।

ব্যোমতত্ত্বে (কণ্ঠে) মহাশিবের দর্শন হইলে পর তিনি উঠিয়া আমায় জ্ঞান উপদেশ দিলেন। তাঁহার অতি সুন্দর রূপ এবং শান্ত মূর্ত্তি। ললাটের ভিতরে জ্ঞান-চক্ষু আছে। সেটাই ত্রিনয়ন। জ্ঞান-চক্ষু না খোলা পর্য্যন্ত দর্শন ঠিক হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়ার আবরণ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরের পর্দ্দা খুলে না। ইহা আমি অনুভব করিয়াছি। সব সময় সাধন-ভজন করিতে করিতে মায়ার আবরণ কাটে।

(১৮)

পদ্মের বিবরণ

মুলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর হেরি,
আশ্চর্য্য হইল চিত্ত কহি যে বিবরি।
মণিপুরে কুণ্ডলিনী শয়ন করিয়া,
দেখিলাম জননীরে আকৃষ্ট হইয়া।
চতুর্ভুজ রূপ তার দেখিতে সুন্দর,
ত্রিনয়নী মাতা মোর অতি মনোহর।

আস্তে আস্তে গুরুদেব হয়ে নারায়ণ,
আসিয়া কহিল মোরে শুন গো এখন।
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন শয়নে,
উঠাইতে হবে মাতা বলি এই ক্ষনে।
চরণ ধরিয়া আমি প্রণাম করিতে,
উঠিয়া বসিল মাতা দেখি আচম্বিতে।
পদ্মের উপর মাতা দশম দলেতে,
বসিলেন চতুর্ভুজা রূপেতে তাহাতে।
তাঁহার কাছেতে এক সর্প শোভা করে,
আকার প্রকার তার কহি যে ভক্তেরে।
কুণ্ডলী পাকায়ে সর্প চারি দিকে চায়,
পরেতে কুণ্ডলী ছাড়ি মোর প্রতি ধায়।
ব্রহ্মময়ী মাতা তায় বলিলেন মোরে,
এই কুণ্ডলিনী সর্প কহিগো তোমারে।
ইহার উপর আমি শয়ন করিয়া,
থাকিতাম নিরন্তর তোমারি লাগিয়া।
ভক্তিমতী হও তুমি দেখিয়া তোমায়,
সর্পের উপর হ'তে উঠিনু ত্বরায়।
হস্তখানি ধরি মোর অতি যত্ন করি,
মণিপুর হ'তে আমায় নেন্ ত্বরা করি।
অনাহত পদ্মে মাতা দিয়া দরশন,
নারায়ণ সঙ্গে মোর করে সম্মিলন।

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী নারায়ণ,
দ্বাদশ দলেতে তিনি করেন শোভন।
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে দীপ্ত হয় তায়,
মনোহর প্রভা তার বর্ণন না যায়।
শ্রবণ করিনু তথা ওঁকারের স্বর,
দেব বালাগণ তথা দেখিতে সুন্দর।
শঙ্খ ঘণ্টা নিয়ে তারা নৃত্য-গীতি করে,
বলে এবার ভক্ত এল ভগবান তরে।
নিনাদ করেন প্রভু শঙ্খনাদ শুনি,
আমার ভকত বলি ধরিল আপনি।
শুনিয়া রসাল তার সুমধুর স্বর,
বিকসিত হ'ল মন তখনি যে মোর।
মোহ অন্ধকার যত ছিল ত ভিতরে,
প্রভুর কৃপায় মোর গেল একেবারে।
কিবা অপরূপ শোভা বর্ণিতে না পারি,
এই বারে বলি ধৈর্য্য ধরি সহ্য করি।
ভক্ত তরে অনাহতে দর্শন যে হয়,
চরণে নূপুর শোভে হস্তেতে বলয়।
পিত-বাস পরিধান আছে সমুদায়,
গলাতে যে মণিময় হার শোভা পায়।
মস্তকে মুকুটখানি দেখিলাম পরে,
বাজুবন্ধ আছে তায় বাহুর উপরে।

কটি-তটে কিঙ্কিনী অতি শোভা পায়,
নূপুরের রুনুঝুনু তাও শোনা যায়।
কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে সূর্য্য সম প্রভা,
মুখচন্দ্র হয় তাতে অতি মনোলোভা।
চন্দ্র সূর্য্য সম চক্ষু বর্ণিতে না পারি,
ধনুক সমান ভুরু হয় যে তাঁহারি।
ললাটের মাঝখানে তিলক শোভা করে,
হেম ময় প্রভা খেলে দেখি চারিধারে।
সুন্দর যে সিংহাসন দেখিনু তথায়,
ডাকিয়া আমারে প্রভু বলেন ত্বরায়।
এই সিংহাসন 'পরি তুমিও বসিবে,
ভক্ত তুমি আকিঞ্চন সদাই করিবে।
তুমি অতি বুদ্ধিমতী ভক্তিমতী তায়,
জ্ঞান-সূর্য্য অন্তরালে আছে গো হেথায়।
খুলিয়া যাইবে সূর্য্য কহি যে তোমারে,
অন্তঃ সূর্য্য বলিলাম জানিবে ইহারে।
তখনি দেখিতে পাই প্রভুর কৃপায়,
অন্তরাত্মা সূর্য্য সেই দেখিনু তথায়।
প্রভুর যে নখ-পদ্ম অতি সুশোভন,
দশ চন্দ্র নখ তায় দেখিনু তখন।
দশ অঙ্গুলিতে দশ চন্দ্র শোভা পায়,
অতি মনোহর তার বর্ণন না যায়।

রাতুল চরণ তাতে শোভা অতিশয়,
ওঁকার বেষ্টিত তথা আছে সমুদয়।
ওঁকারের ধ্বনি সদা শ্রবণে শুনিয়া,
আকৃষ্ট হইল মন কহি বিবরিয়া।
চলিতে শকতি নাই বাহ্যিক ব্যাপারে,
আকৃষ্ট আছে যে মন প্রভুরে নেহারে।
সর্ব্বময় দেখি আমি জগত সংসারে,
সকলি প্রভুর কায়া কহিব কাহারে?
সর্ব্বক্ষণ নানাভাবে মুগ্ধ করে মন,
ক্রমে ক্রমে প্রভুর কত হইল দর্শন।
তার পর দেবী মোরে লইয়া সঙ্গেতে,
চলিলেন ব্যোমতত্ত্বে দেখি আচম্বিতে।
ষোড়শ দলেতে হয় পদ্মের আকার,
শ্বেত বর্ণ পদ্ম হয় কহি এইবার।
ব্যোমতত্ত্বে ভোলানাথ শয়ন করিয়া,
রাখেন যে নরগণে মায়ায় ভুলাইয়া।
যখন গুরুকৃপা হয় জ্ঞানের আলো নিয়া,
উঠায় যে ভোলানাথে চরণ ধরিয়া।
কুলকুণ্ডলিনী মাতা বলিলেন মোরে,
উধাও ভোলালাথে তুমি দেখ কি এবারে?
তখনি যে ব্যোমবাহ্য করিনু বাদন,
ভোলা বলে কেবা এল ভক্ত কোন জন।

আমি বলি ভোলানাথ শুন মোর বাণী,
বিল্বপত্র আনিয়াছি দেখ শূল-পাণি।
চরনেতে পূজি আমি বিল্বপত্র দিয়া,
ভক্ত বলি আদরেতে নেন আকর্ষিয়া।
কুণ্ডলিনী মহাশক্তি ছিল মোর সঙ্গে,
দেখিলাম অতিশয় আমি তাহা রঙ্গে।
ভোলা বলে মহামায়া দেখি যে তোমারে,
আনিয়াছ মোর ভক্ত তুমি মোর ঘরে।
ভক্ত সঙ্গে মিল করি আমি এই বার,
জ্ঞান দ্বারা অগ্নি জ্বালি দিব যে ইহার।
ত্রিনয়নী হবে মাতা জ্ঞানের ভাণ্ডার,
সংসার-নাশন চক্ষু দিলাম তোমার।
মূল চক্র হ'তে ক্রমে পাঁচ চক্র ভেদি,
আসিয়াছ মোর কাছে জ্ঞান-অগ্নি লাগি।
সর্ব্বজ্ঞানে জ্ঞানী তুমি হইবে জননী,
আত্মনিষ্ঠা ভক্তি সদা রাখিবে আপনি।
উঠিয়া বসিয়া ভোলা বলিল আমারে,
অপরূপ মোর রূপ দেখাব তোমারে।
দেখিলাম জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর আকার,
ব্যঘ্র-চর্ম্ম পরিধান ভোলা যে আমার।
ত্রিশূল ডমরু সব করেতে তাঁহার,
চরণে খড়ম দুটি শোভা করে তার।

রজত বরণ হয় তাঁহার চরণ,
কণ্ঠেতে উদয় কাল করে যে শোভন।
করেতে রুদ্রাক্ষ মালা রাম নাম জপে,
জটাজূটধারী প্রভু দেখিনু তাঁহাকে।
মস্তক হইতে মাতা সুরধুনী তায়,
শতধারে বহিতেছে কহিব কাহায় ?
ব্যোমতত্ত্বে ভোলানাথ থাকেন শয়নে,
দেখিয়াছি নিজ চক্ষে বর্ণি যে এক্ষনে।
যখন ভক্তের মন একনিষ্ঠ হ'বে,
ব্যোমতত্ত্বে মহাদেব তখনি জাগিবে।
মোরে ডাকি বলে ভোলা শুন কাত্যায়নী,
আর নাহি অজ্ঞানতা আসিবে জননী।
এইরূপে সেখানেতে করি যে দর্শন,
বলিলেন দেবী মোরে, চল গো এখন।
ষষ্ঠচক্র আজ্ঞাচক্র বর্ণিব এক্ষণে,
দ্বিদলের উপরে দেখিবে নারায়ণে।
ব্রহ্মরূপে নারায়ণ আছেন তথায়,
দেখিতে পাইবে মাতা কহি গো তোমায়।
এইরূপ করে' মোরে হাতেতে ধরিয়া,
লইলেন মহামায়া যতন করিয়া।
সেখানেতে দেখিলাম সুন্দর চিন্ময়,
ওঁকার পরম ব্রহ্ম হইল উদয়।

দ্বিদল উপরে এক ওঁকার শোভন,
জ্যোতির্ম্ময় প্রভা তার কহি আগনন।
সুন্দর ওঁকার ছটা বর্ণিতে না পারি,
স্তম্ভিত হইল মন তাহারে নেহারি।
আর নাহি কিছু দেখি সংসার ভিতরে,
ওঁকার যে সর্ব্বময় দেখি আপনারে।
এইখানে ত্রিনয়ন খুলিয়া যে গেল,
ত্রিনয়ন খুলিল বলি তথা ধ্বনি হ'ল।
জ্ঞান-চক্ষু এটা হয় কহিল ডাকিয়া,
চক্ষু হ'তে অনল যে বাহির হইয়া
সর্ব্ব অঙ্গ দগ্ধ মোর তখন করিল,
জ্ঞানানলে জ্বলে কায়া কিছু না রহিল।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি, কিছু নাই ভবে,
ওঁকারের ছড়াছড়ি দেখিলাম সবে।
সেই হ'তে আর নাহি বাহ্যিক ব্যাপার,
ওঁকারের রূপ তাই কহি যে আমার।
জ্যোতির্ম্ময় রূপ তার সুন্দর যে হয়,
দুই দল চক্রখানি তাহে শোভা পায়।
পরে মাতা মোরে ডাকি কহিল তখন,
চল এবার সহস্রারে হবে সম্মেলন।
এইরূপ করে' আমার হস্তেতে ধরিয়া,
লইলেন সহস্রায় আকৃষ্ট করিয়া।

সেখানেতে সহস্রায় দেখিতে মাধুরী,
সহস্রাতে কত দল গণিতে না পারি।
পদ্ম-নাদ হয় তথা ভাণ্ডের আকার,
খুলিয়া যে দিবে প্রভু দুয়ার তাহার।
ভাণ্ডটী ভাঙ্গিয়া যাবে দেখিবে তখন,
দেখিতে সুন্দর পদ্ম ধবল বরণ।
দেখিলাম দলে দলে বাতির যে শোভা,
তথায় সিংহাসন 'পরি অতি মনোলোভা।
নিনাদ করিয়া তথা বাদ্যভাণ্ড যত,
বাজিতেছে আগনন বর্ণিব তা কত ?
মনোহর সিংহাসন পদ্মের উপরে,
রয়েছেন হরগৌরী তাতে শোভা করে।
সম্মিলন হ'ল বলি বলিল ডাকিয়া,
সপ্ত চক্র ভেদ করি আইলে চলিয়া।
হরগৌরী-রূপরাশি বর্ণিব এবারে,
দেখিয়াছি সেইরূপ কহি গো সবারে।
সহস্রদলেতে প্রভু বসে সিংহাসনে,
কোলের উপর মাতা দেখি দুইজনে।
অর্দ্ধ অঙ্গে ব্যাঘ্র চর্ম্ম করে যে শোভন,
অর্দ্ধ অঙ্গ পরা শাড়ী দেখি যে তখন।
এক হস্তে রুদ্রাক্ষের মালা শোভাকারে,
অন্য হস্তে বলয়াদি কঙ্কণ যে পরে।

অর্দ্ধ কণ্ঠোপরি রাজে ফনি মহারাজ,
অর্দ্ধ কণ্ঠে কণ্ঠমালা অপরূপ সাজ।
এক কর্ণে ধুতুরা যে দেখিতে সুন্দর,
অন্য কর্ণে কুণ্ডল যে অতি মনোহর।
অর্দ্ধ মস্তকেতে জটাজুট প্রভু হয়,
অর্দ্ধ মস্তকেতে মুকুট অতি শোভা পায়।
এক চরণেতে প্রভুর পাদুকা শোভন,
অন্য চরণেতে নূপুর বাজে যে সঘন।
রূপের ছটায় দিশা দীপ্ত করি তায়,
আলোয় আলোয় দেখি স্তব্ধ হ'ল কায়।
চারিদিক আলোময় কিছু নাই আর,
দেখিনু তথায় প্রভু বেষ্টিত ওঁকার।
দুই অঙ্গ এক হ'ল দেখিনু শিবেরে,
হর-পার্ব্বতী মিলন কহি গো সবারে।
আনন্দেতে নাচে মোর প্রাণ আর মন,
যুগল রূপেতে বর দিলেন তখন।
ধন্য হলে কাত্যায়ণী তুমি গো ভুবনে,
ভক্ত বলি সদা তুমি রহ এইখানে।
কিছু দিন সহস্রায় বসতি করিয়া,
লীলা দর্শনাদি কর চিত্ত মন দিয়া।
পর পর শূন্য মহাশূন্য ত দেখিবে,
তার পর ব্রহ্মপদ তুমি যে পাইবে।

পরম পদে গিয়ে মাতা দেহ না টিকিবে,
কিছু দিন এই স্থানে বসতি করিবে।
তোমায় যে ব্রহ্ম জ্ঞান দিলাম জননী,
মহামিলনের শোভা দেখিবে আপনি।
কিছু দিন স্থিতি মাতা ভুবন ভিতরে,
লোকের মঙ্গল জন্য কহি গো তোমারে।
তুমি যে পরম ব্রহ্ম হও সনাতনী,
পরম পদ লাভ করি তুমি গো জননী।
নর-দেহ ধারী হয়ে হেথায় সংসারে,
পেয়েছ পরম পদ তুমি এইবারে।
সাধক সাধিকা যে বা সেবন করিবে,
তোমার চরণ স্পর্শে পরম পদ পাবে।
সেই জন্যে অল্প দিন ধরার মাঝারে,
থাকিতে হইবে তোমায় কহি এইবারে।
স্বধামে যাইবে তুমি আমার সঙ্গেতে,
মন প্রাণ সমর্পণ করেছ আমাতে।
দেখিলাম শেষ পদ্ম আমি গো যখন,
শঙ্খ নাদ বেদ ধ্বনি হইল তখন।
উলুধ্বনি কলরবে বাদ্যের নিনাদ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আসিল সাক্ষাৎ।
কোলে বসাইয়া মোরে বলেন ধীরে ধীরে,
পেয়েছ মা, বহু কষ্টে তুমি ত আমারে।

তুমি ত মা সুরধুনী পতিত পাবনী,
কাত্যায়নী মহামায়া জাহ্নবী জননী।
নারায়নী মহাশক্তি তুমি কাত্যায়নী,
পুরুষ আকারে তুমি থাক মা অবনি!
নাম-সুধা পান মাতা করেছ আপনি,
সপ্ত চক্র ভেদ তোমায় করাইনু আমি।
এইরূপে নারায়ণ কহিলেন মোরে,
যখন যে চক্র ভেদ ডাকিয়া আমারে।
কহিলেন মহাপ্রভু অতি ধীরে ধীরে,
শূন্য পথে চল মাতা তুমি এই বারে।
তার পর শূন্য পথ হইল দর্শন,
বাণী হ'ল শূন্য এই দেখ না এখন।
দেখিলাম শূন্য মধ্যে কিছু নাই আর,
গোলাকার আকাশ এক সুন্দর বাহার।
নীলবর্ণ হয় সেই আকাশের আভা,
কেবল দেখিতে পাই জ্যোতির্ম্ময় শোভা।
নিজ দেহ বলে তখন জ্ঞান নাই মনে,
দেখিতে পাই হৃদয়েতে আকাশ সঘনে।
শূন্য মন শূন্য প্রাণ হইল যখন,
ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু আছে না দেখি তখন।
তখন ঠাকুর মোরে বলিলেন ধ্বনি,
শূন্যপথে চলিয়াছ দেবী কাত্যায়নী।

তার পর মহাশূন্য দেখিনু নয়নে,
সুন্দর যে শ্বেত প্রভা আকাশ সঘনে।
বাণী হ'ল মহাশূন্য দর্শন করহ,
এখানেতে স্থিত হ'য়ে কিছু দিন রহ।
তা না হ'লে দেহ তোমার র'বে না ধরায়,
এই হেতু বলি মাতা থাক গো হেথায়।
মহাশূন্য পরে প্রভু সুন্দর আকারে,
একটি ওঁকার শোভে তাহার ভিতরে।
সম্বিত আছে হেথায় দেখিতে সুন্দর,
জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ চক্রধার।
সেখানে যুগল নাই একাই শ্রীহরি,
আকুল যে করে মণ তাঁহারে নেহারি।
ভক্তিভাবে প্রণাম করিনু প্রভু পায়,
উঠাইল হাতে ধরি প্রভুই আমায়।
কহিলেন এর পরে যাবে ব্রহ্মপদে,
ব্রহ্মপদ পরমপদ পাইবে নিশ্চিতে।
ব্রহ্মপদে গিয়া হইল দর্শন মোর,
শঙ্খধ্বনি হ'ল তথা শুনিতে মধুর।
দেখিলাম ব্রহ্মপদে রয়েছেন গুরু,
শ্বেত পদ্ম মালাধারী অতীব সুচারু।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সদ্‌গুরু ঈশ্বর,
ডাকি বলে মোরে প্রভু আমি চক্রধর।

লয়েছি তোমারে আমি উপদেশ দিয়া,
ব্রহ্ম মন্ত্র দেন মোর কানে ফুকারিয়া।
সদ্‌গুরু পাইলাম পরে আমি যখন,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য মোর হইল তখন।
দেখিতে না পাই আর সংসারের কিছু,
মনের ভিতরে আমি হইলাম শিশু।
মাতা পিতা ভাই ভগ্নী কেহ নাহি আর,
সকলকে দেখি আমি ঠাকুর আকার।
এইরূপে ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠা যখন,
কত মহাজন আসে করিতে বন্দন।
মহাজনগণ বলে হও নারায়ণী,
মোদের উদ্ধার মাতা কর গো আপনি।
বিধি আসে, বিষ্ণু আসে, আসে মহেশ্বর,
ইন্দ্র বেটা আসে তথা হইয়া সত্বর।
চন্দ্র সূর্য্য দেখতে পাই নিজের অন্তরে,
সূক্ষ্ম স্থলে দেখতে পাই কহিব কাহারে ?
গোলোকের দৃশ্য তথা দেখিয়া নয়নে,
সূর্য্যের ভিতর তাও দেখিনু তখনে।
চক্ষু পালটিতে নারি সুন্দর যে হ'ল,
স্নিগ্ধ মন্দ সমীরন বহিতে লাগিল।
প্রভুর চরণ দুটি দুলিয়া দুলিয়া,
পৃথিবী দোলায় মোরে আকুল করিয়া।

দেখতে পাই সর্ব্বদাই দোলনের শোভা,
আপনি দোলেন প্রভু করি মনোলোভা।
আমার এই কায়া বলি নাহি আর জ্ঞান,
প্রভুর সঙ্গেতে দুলি হইয়া সমান।
প্রভু বলেন কাত্যায়নী শুন মোর বাণী,
"সিদ্ধিমাতা" নাম তোমার হইল জননী।
বাহ্য আড়ম্বরে পূজা করিবে না আর,
সকলে পূজিবে তোমায় করিয়া বাহার।
তোমার পূজাতে পূজা আমার হইবে,
সেই হেতু মনে তুমি দ্বিধা না করিবে।
তোমায় করিলে পূজা মম পূজা হবে,
ব্রহ্মরূপ তব অঙ্গে প্রকাশ পাইবে।
জ্যোতির্ম্ময় হয়ে আমি তব অঙ্গে রব,
তোমার সঙ্গেতে সদা আনন্দ করিব।
সে কারণে ঠাকুরের বচন শুনিয়া,
করিবারে দেই পূজা ঠাকুর বলিয়া।
ঠাকুর বলিল মোরে কীর্ত্তন করিতে,
নাম-রসসুধাগান তাকে শুনাইতে।
তখনই মুখ হ'তে নাম ধ্বনি করি,
ফুটিল অমৃত সুধা গানের লহরী।

গান

বল হরি বিনে ওরে মন, এ সংসারে আছে কি ধন।
সেই যে হরির নাম করিবি, সুধা সিন্ধু পান করিবি।
ভবের ক্ষুধা যাবে দূরে নাম সুধা পিবি অনিবার।
হবে না রোগের সঞ্চার নাম সুধা পিবি আনিবার।
সেই নাম সুধা পেলে পরে, ভবরোগ যাবে দূরে।
আসবে না আর তোমার ঘরে সেই কাল শমন।
নাম সুধা যে পান করিবি, নিশ্চয় অমর হইবি,
অহরাত্র নাম করিবি, হরির নামে বিকাইবি
নামে আঁখিতে জল বহাবি, তাঁহারে প্রাণ সঁপে দিবি।
আপন ভেবে প্রাণ সঁপে দিবি।

পরে পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া,
অল্প কিছু দিন মাতা ছিলেন বসিয়া।
পরমপদের দৃশ্য কহিতেন জননী,
বর্ণিতে যে তাহা নারি, কহিব কি আমি?
পরম ব্রহ্ম আছেন হেথায় সুন্দর আকারে,
জ্যোতির্ম্ময় হয় শোভা শ্বেত রূপ ধরে।
ঝলমল করে তথায় জ্যোতির যে ছটা,
সর্ব্বরূপে ওঁকারের হয় বড় ঘটা।
"ব্রহ্ম আমি" বলে মোরে কহিলেন তিনি,
ব্রহ্ম ছাড়া আর সব মিথ্যা বলে মানি।
আমি বলি ব্রহ্ম নহে মধুর ভাব লব,

হৃদয় মধ্যেতে মোর ভক্তি ত রাখিব।
প্রভু বলে, তুমি ব্রহ্ম হও সিদ্ধিমাতা,
মধুর মিলন মোর হইবে সর্ব্বদা।
সেই হেতু ঠাকুরের ব্রহ্ম নাম ধরি,
ব্রহ্মধন বলি এই দেহ জ্ঞান করি।
ঠাকুর হৃদয়ে ব্রহ্ম আবির্ভূত হয়ে,
জ্বালিলেন ব্রহ্ম-অগ্নি হৃদয়ে বসিয়ে।
পঞ্চ দিকে পঞ্চ অগ্নি জ্বালিলেন তায়,
পঞ্চকুণ্ড সারি সারি দেখিনু তথায়।
ধ্বনি হ'ল ব্রহ্ম নাম একতা করিয়া,
পঞ্চতত্ত্ব যতকিছু সমতা লইয়া।
সাধন করিলে মাতা একান্তে বসিয়া,
তাহারই ফল এবে দেখ নিরখিয়া।
সেই জ্ঞান ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলিল তোমার,
দেহখানি দগ্ধ মাতা হইল এবার।
স্থূল দেহ নয় ইহা, ব্রহ্ম দেহ জানি,
সেবন করিবে যেবা মঙ্গল তখনি।
ভক্তি ভাবে যে সাধক পূজিবে তোমারে,
আমি ব্রহ্ম, আমি গুরু, তোমার ভিতরে।
ব্রহ্ম লাভ হবে তার ভক্তি যদি করে,
সদ্‌গুরু ঈশ্বর তুমি কহিনু তোমারে।
উপহাস করে নর এ কথা শুনিয়া,
কে পেয়েছে হেন ধন দেখুক বিচারিয়া।

নিরাকার সাকার যে দর্শন করিলে,
এখন নিরাকারে ব্রহ্ম হইয়া রহিলে।
কিছু দিন পরে মাতা স্বধামে গমন,
পরম পদে স্থিত মাতা রহিবে এখন।
শীঘ্র এই স্থূলদেহ ছাড়িয়া আসিবে,
আমার সঙ্গেতে তুমি মিশিয়া যাইবে।
বৎসর দুই এক থাকিবে ধরায়,
যে জনার সৌভাগ্য সে সেবিবে তোমায়।
পরম ব্রহ্ম নারায়ণী তুমি সিদ্ধিমাতা,
সাধনের শেষ তোমার হইল যে হেথা।
সাধন সমাপ্তি করি বসনা এখন,
পরম ব্রহ্ম, পরম পদ পেয়েছ যখন।
চিরকাল পরম পদে স্থিত হয়ে রবে,
চতুর্যুগ কাল তব ক্ষয় নাহি হবে।
পরম পদে স্থিতি মাতা হ'ল কাত্যায়নী,
সাধন সমাপ্তি তোমার হইল জননী।
এইরূপে ডাকি মোরে বলে বারে বারে,
বুঝিতে না পারি আমি কে বলে কাহারে।
তখন দেখিনু স্থূল অঙ্গের উপরে,
ফুটেছে অক্ষর গুলি সুন্দর আকারে।
সাধন সমাপ্তি বলি লেখা আছে তায়,
দেখিতে না পাই বিষ্ণু আছেন কোথায়।

নিরাকার জ্যোতিরূপ পৃথিবী ছাইয়া,
অঙ্গ নাই আমার যে দেখি নিরখিয়া।
সর্ব্ব অঙ্গ জ্যোতিভরা দেখি চারি ভিতে,
শ্বেত জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিনু তাহাতে।
পালটিতে নারি আঁখি জ্যোতিরূপ হেরি,
প্রভুর অপার লীলা কহিতে যে নারি।
সর্ব্বদিকে জ্যোতির্ম্ময় প্রভু যে আমার,
চক্ষু ঝলসিয়া যায় কহিব কি আর ?
ব্রহ্মনাম উচ্চস্বরে নিনাদ হইল,
পরম পদে স্থিতিমাতা ডাকিয়া কহিল।
সর্ব্বরূপ দেব তুমি হও মা জননী,
পুরুষ আকারে মাতা তুমি মা অবনি।
নিরাকার সাকার মা দেবী কাত্যায়নী,
পরম ব্রহ্ম রূপ তব শুন মা জননী।
শঙ্করী, ভবানী, উমা তুমি মহেশ্বরী,
আদি, মধ্য নাই তব অন্ত নাহি করি।
জ্ঞান-বৈরাগ্য লাভায় সর্ব্বদেবৈর্নমস্কৃতাম্।
বিশুদ্ধ চরিতাং দেবীং ভজে ভগবতীমহম্॥
জ্ঞানাম্মহাদ্যুতি জ্ঞানং জ্বলন্তং জ্ঞানতেজসা,
মহাকালং মহাকায়ং মহাকালেঽপি সংস্থিতম্॥
ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং।
নমামি ভগবন্তং ত্বং তদ্ভক্তোঽহং তদাশ্রিতঃ॥

নমামি ত্বাং জগন্মাতঃ ব্রহ্মরূপেন সংস্থিতে।
জগদ্‌গুরুর্ভব ত্বং হি নারায়ণ সমন্বিতা।
অহঙ্কারং ধ্বংস দেবি মায়াং মোহং চ সংহর।
ব্রহ্মবিদ্যাং যস্য দেবি বস মে হৃদয়ে সদা॥
জ্ঞানাঞ্জনস্য মূলং চ পশ্যেয়ং ত্বৎ প্রসাদতঃ।
অজ্ঞাননাশনং দেবি সর্ব্বরূপেন সর্ব্বদা॥
ধ্যানাৎ পাদারবিন্দস্য ভক্তিমার্গং লভেয় তে।
স্পর্শাৎ পাপং নাশয়েয়ং পূজয়া জ্ঞানমাপ্নুয়াম্॥
সাক্ষাৎ ভগবতী ত্বংহি মূলং সর্ব্বাস্থিতে রসি।
দুর্গা, শিবা, ক্ষমা ধাত্রী, ব্রহ্মরূপা, চিরন্তনী॥
পদস্পর্শে সদা মুক্তির্বাঞ্ছিতং লভ্যতে ফলম্।
অজ্ঞাননাশিনি দেবি নমামি ত্বং সুমঙ্গলে॥
সিদ্ধিদাত্রী ত্রাণকর্ত্রী ত্বং জগদ্ বন্ধনাপহা।
শান্তিং তুষ্টিং লভেদ্ ভক্তস্তব পাদাব্‌জ সেবনাৎ॥
সর্ব্বে রোগাঃ, সর্ব্বে শোকাঃ, নশ্যেয়ুস্তে পদার্চনাৎ।
ভক্তশ্রেষ্ঠে ত্বং হি দেবি পূজিতা ভব মণ্ডলে॥
সর্ব্ব দুঃখ হরে নিত্যং পরব্রহ্মস্বরূপিনি।
ওঁ কার শোভিতে দেবি ত্বং নমামি পুনঃপুনঃ॥ *

এইরূপে স্তুতি করে ঠাকুর যখন,
আকুল হইয়া আমি বলিনু তখন।

* উক্ত শ্লোকগুলি যে পাত্রে প্রকাশ হইয়াছে তাহার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান আদৌ নাই। ব্যাকারণের হিসাবে তাতে অনেক ত্রুটি আছে বটে কিন্তু সে সব ভাবাবিষ্ট অবস্থায় প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া তাতে কোন পরিবর্ত্তন না করে অবিকল ভাবেই দেওয়া উচিত বুঝা গেল।

কিবা কর প্রভু মোরে করিয়া অন্যায়,
স্তবন করিয়া বল তুমি হে আমায়।
ঠাকুর বলিল মোরে শুন শুদ্ধমতি,
ভক্তিমার্গ পথ তুমি ধরিয়াছ সতী।
ভক্তের বড়াই মান করি ত সতত,
ভক্তের কাছেতে আমি সদা হই নত।
ভক্তই আমার হয় মাননীয় অতি,
ভক্তের প্রেমেতে আমি বাঁধা থাকি সতী।
দ্বাপরেতে বৃন্দাবনে নন্দের বাঁধা বই,
রাধা রাণী মোর অঙ্গ তোমারে যে কই।
ভক্তিভাবে একাগ্রতা করিয়া যে রাধা,
নিয়েছিল মোর অঙ্গ হৃদয়ে সর্ব্বদা।
সত্যযুগে হয়েছিলাম বলির দুয়ারী,
দ্বাপরেতে দ্বারবান করেছি চাকরী।
ত্রেতাযুগে আমি রাম অবতার হয়ে,
চণ্ডালের সঙ্গে মৈত্রী করিলাম গিয়ে।
শবরী উচ্ছিষ্ট মোরে খাওয়াইল সুখে,
আমিও খাইনু তাহা পরম কৌতুকে।
কলিকালে হই আমি বুদ্ধ অবতার,
মুক্তিমার্গ দেখাইনু করি ব্যবহার।
শেষেতে চৈতন্য হয়ে নাম বিলাইয়া,
পাষণ্ড উদ্ধার করি হরিনাম দিয়া।

ভকতের কাছে আমি দাসত্ব যে করি,
ভক্তের প্রেমেতে আমি যাই গড়াগড়ি।
আপনারে স্তুতি আমি করিনু আপনি,
সেই হেতু কিবা ভয় শুন কাত্যায়নী।
প্রণামি আমার পায়ে আমি বারবার,
ভক্তের চরণ হয় চরণ আমার।
নির্ভয়ে থাকিবে এবার ধরার মাঝারে,
আর কোন মায়াজাল স্পর্শিতে না পারে।
এইরূপে ঠাকুর মোরে অভয় দিয়া,
কহিলেন মিষ্ট স্বরে বচন অমিয়া।
তথাপিও মনে মনে ভয়ে ভয়ে মরি,
যদি ত্রুটি হয় মোর বঞ্চিবেন হরি।
আকুল হইয়া থাকি আসনে বসিয়া,
'সাধন সমাপ্তি' বলি কহেন ডাকিয়া।
সেই হ'তে চিত্তমোর শান্ত হয়ে গেল,
পরম রঙ্গেতে প্রভু অঙ্গেতে রহিল।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখি মোর চরণের শোভা,
ওঁকার শোভিত পদ্ম অতি মনোলোভা।
জ্যোতির্ম্ময় ছটাজাল কহিতে না পারি,
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলে অঙ্গে দেখি সারি সারি।
পদ অঙ্গুষ্ঠ হইতে সর্ব্ব অঙ্গ বেরি,
মস্তক ছাইয়া যায় দেখে ভয়ে মরি।

তখনি কহিল প্রভু আমারে ডাকিয়া,
ব্রহ্ম অগ্নি এটা হয় ভয় কি লাগিয়া।
ব্রহ্ম অগ্নি লাগিয়াছে তোমার অঙ্গেতে,
পুড়াইল দেহখানি সম্পূর্ণ রূপেতে।
তখনি দেখিনু আমি চিন্ময় আকারে,
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ রয়েছে ভিতরে।
তাঁহার জ্যোতিতে মোর দেহখানি ভরি,
রয়েছে যে অঙ্গভরা অতি মনোহারি।
দেখিলাম কত ঘর কত আছে বাড়ী,
সপ্তলোক সাত সমুদ্র আছে সারি সারি।
সকল হইনু পার প্রভুর কৃপায়।

হাটিয়া চলিয়া যাই, ফিরে আর নাহি চাই,
মায়া মোহ না ছু'ল আমায়।

সাধন করিনু যবে, দেখেছিনু এই সবে,
শ্বেত গঙ্গা সরস্বতী আদি।

যমুনা, গঙ্গা, সরস্বতী, এ হয় ত্রিকোণ বেদি,
ত্রিরূপেতে ভক্তের অন্তরে।

বাহিরে ত্রিগুণ যাহা, আজ্ঞা চক্রে খেলে তাহা
ভক্তগণ দেখতে পায় তাই।

ত্রিগুণ অতীত করি, ভজিতে হবে শ্রীহরি,
মায়া মোহ সকল দূর করি।

মায়াতীত হয় যখন, ত্রিবেণী দর্শন তখন,
শ্বেত সমুদ্র পদ্মা নাম ধরি।
মান সরোবর আদি, দেখিয়াছি নানা বিধি,
নদ নদী কত অগণন।
শত শৃঙ্গ পর্ব্বত তায়, পঞ্চ শৃঙ্গ দেখা যায়,
তিন শৃঙ্গ সমিষ্ঠান হয়।
এক শৃঙ্গ পর্ব্বতেতে, কৈলাস আছেন তাতে,
মহেশ্বর পার্ব্বতী সহিত।
নন্দি ভৃঙ্গি দ্বারবান, দেখি করে সম্মান,
নিয়ে গেল কৈলাস উপরে।
বিল্ব পত্র সারি সারি, মহেশ্বর নাম ধরি,
ব্রহ্ম নাম লিখেছে তাহাতে।
বীজ মন্ত্র না বলিব, হরের নাম সদা লব
পার্ব্বতী পতি মহেশ্বর।
আদর করিয়া মোরে নিলেন কৈলাস পরে
দেখিলাম কৈলাসের শোভা।
ধ্বজ পতাকা উড়ে সবে শিব মূর্ত্তি ধরে,
রাম নাম জপে দিবানিশি।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান ডম্বরু যে হাতে,
গলায় রুদ্রাক্ষমালা শিঙ্গা বাজায় তাতে।
ব্যোম্ ব্যোম্ রবে সব নৃত্য করে তায়,
আমায় দেখিয়া সবে নাচে উভরায়।

বলে সবে সিদ্ধিমাতা এসেছ জননী,
কিছু দিন এইখানে থাক মাতা তুমি।
তিন বৎসর সেথা আমি করিয়াছি বাস,
পরেতে যে নিত্যলীলা হইল প্রকাশ।
যখন যা দর্শন মোর হইত সূক্ষ্মেতে,
তখনি বাণী হ'ত শুনিতাম শ্রবণেতে।
মহারাস দেখিয়াছি গোলোক ধামেতে,
রাধাকৃষ্ণ রাসলীলা করেন তাহাতে।
ওঁকার বেষ্টিত তাদের অঙ্গ আছে বেরি,
সর্ব্ব অঙ্গে জ্যোতি শোভা দেখি সারি সারি।
চন্দ্র সূর্য্য জ্বলিতেছে দীপ্ত করি প্রভা,
তারাগণ বেষ্টিত যে হয় মনোলোভা।
প্রভুর সে মুখচন্দ্র দেখিতে সুন্দর,
পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ দেখি দামোদর।
আছে কত জন দ্বারী প্রভুর দুয়ারে,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সবাকার করে।
প্রভুর রূপের ছটা বর্ণিতে না পারি,
রাধাকৃষ্ণ যুগল মিলন আহা মরি মরি।
শ্বেত বর্ণ রাধা রানী দেখিতে সুন্দর,
শ্বেত কৃষ্ণ হয় তথা অতি মনোহর।
সত্যের প্রকাশ এই সত্যের লাগিয়া,
গোলোকের দৃশ্য এই কহি বিস্তারিয়া।

কৌস্তুভ মণির মালা তাঁহার গলাতে,
চরণে নূপুর শ্বেত কহি যে তাহাতে।
হস্তেতে বলয় শ্বেত অতি মনোহর,
কর্ণের কুণ্ডল শ্বেত উজ্জ্বল তৎপর।
মস্তকে মুকুট হয় শ্বেত যে ওঁকারে,
নাসিকায় গজ মুক্তা অতি শোভাকরে।
প্রভুর ললাট পরে ওঁকার তিলক,
রাধারানী ওঁকারেতে দেখিনু গোলোক।
দুইজনে একসঙ্গে মিশিয়া তথায়,
রাধাকৃষ্ণ একঅঙ্গ দেখিনু সেথায়।
দেখিলাম সেথা আছেন শুকদেব ঋষি,
ধ্যান যোগে মগ্ন তিনি হইয়া যে খুশী।
মা বলে ডাকেন তিনি যোগ ভঙ্গ করি,
পেয়েছি তোমায় মাতা অতি যত্ন করি।
ষোড়শায়ু বালক প্রায় পরম হংস হয় তায়,
সুন্দর দেখিতে হয় অঙ্গ।
স্তুতি করে নারায়ণে আসিয়া আমার সনে
কথা কহে করিয়া যে রঙ্গ।
আসিয়াছ মাই তায় প্রণমি তোমার পায়,
মা তোমার কোলেতে উঠিব।
মাতৃছাড়া হয়েছিনু মা তোমারে পাইনু
তাই তব কোলেতে বসিব।

শুকদেব কোলে করি বসিনু তখন,
নারায়ণ ডাকি বলে ভকত মিলন।
তখন আমি নারায়ণে প্রণাম করিনু,
মহালক্ষ্মী দেখিয়া যে আকুল হইনু।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে হাতেতে ধরিয়া,
বসাইল মধ্যস্থলে আদর করিয়া।
এক পাশে নারায়ণ অন্য পাশে মাই,
জ্যোতিতে জ্যোতিতে মিশি এক হইনু তাই।
নারায়ণ বলে দেখ গোলোক দেখিলে,
সংসারের গোলমাল সব মিটাইলে।
আর নাহি আসিবে মা সংসারে কখন,
পরম জ্যোতিতে মাগো রহিবে এখন।
সেই হ'তে ব্রহ্মভাবে রহিনু ধরাতে,
পরম ব্রহ্মরূপ মোর রাখিয়াছি চিতে।
মধুর মিলন সদা ঠাকুর সহিতে,
অচল হইনু আমি তাঁহার ভক্তিতে।
সদা ভক্তি ভাবে করি তাঁহার সেবন,
হৃদয়েতে রাখি আমি যুগল চরণ।
অন্তরেতে আছে মোর "তুমি আমি ভাব",
বাহিরেতে ব্রহ্মময়ী আমিই কেশব।
জগতের কাছে আমি ব্রহ্ম ভাব নিয়া,
অন্তরেতে দাস্যভাব রাখিব ধরিয়া।

ভক্তি ছাড়া গতি নাই ভক্তিই রাখিব,
ঠাকুর বলিয়া সদা এদেহ ধরিব।
সেই হেতু তোমাদের বলি সর্ব্বক্ষণ,
ঠাকুরের কার্য্য সব কর কি কখন ?
যখন যা কর তোমরা ঠাকুরের কাজ,
মঙ্গল হবে তাতে কিবা আছে লাজ ?
যতটুকু যে করিবে পার হয়ে যাবে,
ঠাকুর ভাবিয়া যদি কার্য্যটি করিবে।

---

(২০)

মিলন-মিশ্রণ

মিলন-মিশ্রণে সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গে মন লীন হইয়া যায়। দেহজ্ঞান বলিয়া কোন জ্ঞান থাকে না। ভগবানের সঙ্গে এক অঙ্গ। এই যে স্থূলকায়া অঙ্গ তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঠাকুরের সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিশিয়া যায়। তাহাতে কোন রকম আবরণ থাকে না, মায়াতীত হইয়া যায়। আমি যে কোন ব্যক্তি, ইহা মনে হয় না। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বদা নীল আকাশ। মহাপুরুষের জ্যোতিতে নিজের অঙ্গ ঢাকিয়া যায়। আনন্দে বিভোর হইয়া ভক্ত ঠাকুরের কোলে বসিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ করে। ভক্ত স্ত্রী হইলে পুরুষ আকার ধারণ করে, পুরুষ হইলে স্ত্রী হইয়া যায়। কোন কোন সময় মিলন-মিশ্রণে ঠাকুরের

সমস্ত অঙ্গে নিজের অঙ্গ লিপ্ত হইয়া যায়। জগতের কোন জ্ঞান থাকে না। সুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দেহ, শিব শক্তির ন্যায় এক লিঙ্গ হইয়া যায় তাহাতেই ভক্ত বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া অনুরাগের সহিত নিজের মনকে লয় করিয়া লয়।

ত্রিগুণাতীত হইয়া যায়। ওঁকার বেষ্টিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের সমান মিলন হইয়া থাকে। এক অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে মিশান। তাহাতে কোনরূপ কুবুদ্ধি উদয় হয় না। ত্রিগুণাতীত অবস্থা হয়। সুন্দর জ্যোতিতে সর্ব্বদাই দেহ ভরিয়া থাকে।

মহামিলন-মিশ্রণ যোগে ওঁকার শব্দ উঠে। পরমপুরুষকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ দেখিয়া অহং তত্ত্ব ভুলিয়া যায়, আমি ওঁ ব্রহ্ম। জগৎ মিথ্যা, তুমি সত্য। পরম ব্রহ্মে লীন হইয়া 'আমিই তুমি,' "তুমিই আমি" এছাড়া ভক্ত আর কিছু জানে না শান্ত হইয়া যায়, চিত্ত বৃত্তি উঠে না। কায়া-ছায়া কিছু থাকে না। মহামিলন-মিশ্রণে কোনরূপ অবস্থা হয় না। মহামিলন-মিশ্রণ হইলে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভক্ত কেবল ভগবানকে দেখিতে থাকে।

ভূমণ্ডলে কিছু নাই শুধু তুমি আছ,
আমার আমার বুলি হরে ত নিয়েছ।
সকলই তোমার প্রভু কায়া যে তোমার,
মিলন-মিশ্রণ যোগ তুমি লইলে এবার।
ভক্তি দিলে শক্তি দিলে বিচার করিয়া,
পরম ব্রহ্মে লীন মন করিলে আসিয়া।
জ্যোতির্ম্ময় তব রূপ অঙ্গেতে ঢালিল,
আমার বলিয়া প্রভু কিছু না রহিল।

তোমার অঙ্গেতে অঙ্গ মিশাইয়া হরি,
নীলময় অঙ্গ মোর দেখি তাড়াতাড়ি।
এক অঙ্গ হয়ে শুধু তব সঙ্গে রই,
বিচার করিয়া আমি তত্ত্ব কথা কই।
মিলন-মিশ্রণ যোগে শুধু এক অঙ্গ ধরি,
ঠাকুরের অঙ্গে অঙ্গ মিলন যে করি।
সাদরে ঠাকুর সঙ্গে আলাপন সদা,
বিষ্ণুর অঙ্গেতে মোর অঙ্গ হয় হেথা।
ভবখেলা সাঙ্গ হয় মিলন-মিশ্রণ যোগে,
অনুক্ষণ দেখতে পায় অঙ্গে আছে লেগে।
এক ভিন্ন দুই নাই একাকার হয়ে,
ঠাকুরের অঙ্গে থাকি সর্ব্বদা লাগিয়ে।
ভক্তজনের সঙ্গে সদা এক অঙ্গ ধরে,
এক অঙ্গ ছাড়া নাই কহি বিচার করে।

---

(২১)

স্তর ভেদ

আগে বিশ্বাস, পরে দীক্ষা। গুরু যে দীক্ষা দিবে তাহাকে খুব বিশ্বাস করিয়া ধরিতে হয়। তাহা হইলেই ঠাকুর দয়া করেন। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর এই চক্রগুলি ভেদ হয়। তারপর কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন। তখন ভক্তের চৈতন্য আসে,

অচৈতন্য ভাব দূর হয়। তখন ভক্ত গদগদ হইয়া ব্যাকুলভাবে আরও জোরে ভগবানকে ডাকিয়া থাকে। সেই সময় তাহার মাঝে মাঝে জড় চৈতন্য অবস্থা হয়, সমাধিস্থ হইয়া যায়। কখন বা কাঁদে, কখন বা হাসে পাগলের মত। তারপর ঠাকুর দয়া করিয়া নানা রকম ছবির মত দর্শন দেন। তাহাতে ভক্তের মন কিছু স্থির হয়, কিন্তু তাহাতেও তৃপ্তি আসে না। চিত্ত অস্থির। তবে সাধনে জোর আসে। অনাহতের ধ্বনি যখন শুনতে পাওয়া যায়, তখন মন স্তব্ধ হয়। বিশুদ্ধ চক্রে জ্যোতি দেখা যায়। অনাহতের ধ্বনি ও জ্যোতিরূপ দেখিলে ভক্তের মনে আনন্দ আসে। লীলা দর্শন হইলে পর ভক্ত আনন্দে গোবিন্দ বলিয়া ডাকিতে থাকে। গোবিন্দ আসিয়া ভক্তের সঙ্গে নানা রকম লীলা করেন, মাঝে মাঝে দর্শন দেন ও মাঝে মাঝে লুকাইয়া যান। লুকাচুরির মত ভগবান ভক্তের সঙ্গে খেলা করেন, তাহাও ভক্তের মঙ্গলের জন্য। তাহা না হলে ব্যাকুলভাব আসে না, সেইজন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে অদৃশ্য হইয়া যান। কিছুদিনের পর মহাশিবের দর্শন হয়। তাঁহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তিনি ত্রিশূলাঘাতে ভক্তের ত্রিনয়ন খুলিয়া দেন। আজ্ঞাচক্রে ত্রিকোণ মণ্ডলের মধ্যে শিব লিঙ্গ দেখা যায়। কোন কোন সময় আজ্ঞাচক্রে নারায়ণকেও দেখা যায়। হৃদয়ের অষ্টদলে ভগবানকে দেখা যায়। ষোড়শ দলে মহাশিব, ব্যোমতত্ত্বে। সহস্রাতে মহামিলন দর্শন হয়। তখন পর্য্যন্ত ভক্তের মনোবৃত্তি পূর্ণভাবে যায় না। আত্মদর্শনের পর মনোবৃত্তি কিছু লীন হইয়া যায়।

ছবির মত দর্শনে কোন কাজ হয় না। যখন পাকাপাকি দর্শন হয় তখন মনোবৃত্তি সব লয় হইয়া যায়। আগে আত্মদর্শন, পরে সহস্রায় মিলন, তবে হয় শূন্য সংযোটন। পর-পারের বন্ধু একজন, আসিয়া করেন আহ্বান। মহাশূন্যের আগে শূন্য দর্শন, তার আগে হয় কৈলাশ আগমন। তখন ভক্তের তাহাতে স্থিতি হয়। শিবের কাছে দিব্যভাবে জ্ঞান নেয়। তারপর মহাশূন্যে আসিয়া ব্রহ্মজ্ঞান পায়। ব্রহ্মের অনুসন্ধানে ভক্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, এবং তুমি কোথায় বলিয়া আর্ত্তনাদ করে। জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে দেখিতে পাইয়া প্রত্যক্ষ করে এক ভিন্ন অন্য কিছু নাই। তখন সদ্‌গুরু ভক্তকে উপদেশ দেন। কিছুদিন ব্রহ্মে স্থিতি হয়, তারপর পরমব্রহ্মে মন লীন হইয়া যায়, আর কিছুই জগতে দেখিতে পায় না। তখন ঠাকুরের সঙ্গে মিলনমিশ্রণ যোগ হইয়া যায়। তারপর পূর্ণব্রহ্ম অবস্থা ধারণ করে। তারপরে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম হইয়া পরম পদে গতি হয়। পরমপদে গতি হইলে আর দেহ থাকে না।

হৃদয়ে চতুর্থ চক্র খুলিলে অন্তঃসূর্য্যের দর্শন হয়। অন্তঃসূর্য্যের দর্শন যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ সাধক অন্ধকারেই থাকে। অন্তঃ-সূর্য্যের যখন প্রথম দর্শন হয় তখন ত্রিগুণ নিয়া দর্শন হয়। লাল, হল্‌দে, নীল এই রকম জ্যোতি দেখা যায়, সপ্তরঙ্গ। যখন ভক্ত গুণাতীত হইয়া যায়, তখন এক সাদা জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য দেখা যায়, সেইটা হয় আত্মদর্শনের পর—সর্ব্বদাই দেখা যায়। আত্মদর্শন ও অন্তঃসূর্য্য প্রকাশ প্রায় একই। ভক্তকে ঠাকুর নানারূপ দর্শন

দিয়া থাকেন। যে যেরকম ভক্ত হয় ঠাকুর তাহাকে সেই রকম দর্শন করাইয়া রাস্তা দিয়া লইয়া চলেন। এইসব বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সূক্ষ্ম জগতের কথা স্থূল জগতের সঙ্গে মিলে না। শাস্ত্রের সঙ্গে সব দর্শনের মিল হয় না, বহু দর্শন আছে।

সপ্তচক্র ভেদ করি মিলায় কেশব,
পরাস্থিতি পরাজ্ঞান লয় যে মানব।
অপরা ও পরাভক্তি দুটি ভাব আছে,
পরা ভক্তিভাব কহি তোমাদের কাছে।
অনন্য ভক্তিতে সদা ভগবান মিলে,
সর্ব্ব সময় থাক তুমি অতীব কৌশলে।
সার তত্ত্বকথা সদা ভক্তিভাবে রবে,
জ্ঞান বৈরাগ্য নিয়ে সদা সংসার ত্যজিবে।

১। সপ্তচক্র ভেদের পর এবং আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরাজ্ঞান, পরাশান্তি, পরাভক্তি, পরামুক্তি, পরাবৈরাগ্যাদি-ভাবের প্রতিষ্ঠা হয়।

২। পরিপূর্ণ ব্রহ্মই গোলোক। নিত্যলীলা, সেখানে মহা-রাসের দর্শন। ঠাকুরের সঙ্গে আত্মার অভেদ। রাধাকৃষ্ণভাবে লীলা করা হয়, অথবা শিবশক্তিকে নিয়াও লীলাখেলা চলে।

৩। মহাকৈলাশ ও গোলোক পাশাপাশি, প্রায় একই। একই সব, সবই ব্রহ্মই। উপরে নীচে কিছুই বলা যায় না।

(২২)

অবস্থা ভেদ

সাধকের চারিপ্রকার অবস্থা হয় :—প্রথম, মধ্যম, উত্তম ও উত্তমোত্তম।

প্রথম অবস্থায় কেবল বিশ্বাস ও কাকুতি ভাব। মধ্যম অবস্থায় দেবদেবীর দর্শন, দেবদেবীর দর্শন হওয়ার সময় ঠাকুর সাধককে নানা সিদ্ধাই দিতে আসেন, নানা রকম বিভূতি দেখান। তাহাতে যদি সাধক ভুলিয়া যায়, তাহা হইলেই পড়িয়া গেল। ঠাকুর বহু রকমে ছলনা করিতে চাহেন। সিদ্ধাই নিলে ত আর কিছু হয় না, কেবল অদ্ভুত অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়া লোক ভুলান হয়। তাহাতে আত্মার কোন উন্নতি নাই। এটা মধ্যম অবস্থা।

উত্তম অবস্থায় ভগবানকে খাঁটি খাঁটি দর্শন করা যায়। তাহাতে মনের স্থির শান্ত ভাব হইয়া, জড় চৈতন্য ছাড়িয়া চৈতন্য সমাধি হয়। জ্ঞান, পরাবৈরাগ্য ও পরাশান্তি আসিয়া যায়। তখন ভক্ত পরাপ্রেমের অধিকারী হইয়া অপরাপ্রেম ছাড়িয়া যায়। অপরাপ্রেমের অর্থ দেহ ও জড় জগতকে ভালবাসা, জড়ের ধর্ম্ম স্বীকার করা।

উত্তমোত্তম অবস্থায় সর্ব্বসময় জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখা যায়। আকার সাকার কিছুই থাকে না। নিরাকারেই মন লয় হইয়া থাকে। তখন ভক্ত আত্মহারা হইয়া যায়, ইহাকে আত্মসমর্পণ বলে। তখন ঠাকুরের সঙ্গে একজ্ঞান, একজ্যোতি ছাড়া ভক্তের

আর কিছুই থাকে না। ব্রহ্মের সাকার মূর্ত্তি লুপ্ত হইয়া যায়, কেবল জ্যোতির্ম্ময় দেখা যায়।

এই সমস্ত অবস্থার কিঞ্চিৎ ভেদ বর্ণনা করা গেল।

(২৩)

ভক্তিভাব নিয়ে থাকা খুব ভাল, ভক্তিভাব হইলে পর ভগবানকে শীঘ্র লাভ করা যায়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এই চারিপ্রকার ভাব ভক্তের হয়। সকলের শ্রেষ্ঠ ভক্তি, যার ভক্তি হৃদয়ে গ্রথিত হইয়াছে, সে ভগবানকে ভালবাসে। অন্য কিছু তাহার কাছে নগণ্য বলিয়া মনে হয়। পরমপিতা সেই ভগবান, পরম মাতা ভগবতী। যেমন বালকেরা পিতা মাতার কাছে আবদার করে, তেমনিভাবে ভগবানের কাছেও ভগবতীর কাছে ভক্ত আবদার কারিয়া থাকে যদি সে রকম ভাবে ভগবানকে ভালবাসিতে পার তবে তোমাদের কোন দুঃখ বা দৈন্য থাকে না। ভগবানের কাছে সর্ব্বদা দৈন্য নিয়া আরাধনা করিতে হয়। সংসারে সন্তান যতদিন বালক থাকে পিতামাতা ততদিন লালন পালন করে। ভগবান পরম পিতা, তিনি চিরদিন ভক্তকে লালন পালন করিয়া থাকেন। যদি তাঁহার উপর একান্তভাবে ভক্তি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে তিনি কখন বঞ্চিত করেন না। তাঁহার চরণারবিন্দু ভক্ত সর্ব্বদাই দেখিতে পায়, এবং সব সময় তিনি সম্মুখে থাকেন। তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা হয়। ইহা আমি খুব জানি, আমার এই অনুভূতি হইয়াছে। তোমরা সংসার

নিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইবে আর বলিবে যে কই, ভগবান ত আমাদের দয়া করিলেন না? সে যে দয়ার সাগর। তাঁহার অপার দয়া। মনপ্রাণ খোলসা করিতে হয়। মনে কপটতা রাখিতে নাই। কপটতা রাখিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। তাঁহার উপর মনপ্রাণ সমর্পণ কর। মধ্যে মধ্যে উপবাস করিতে হয়। তাহা না হইলে ভিতরে যে অসুরগুলি আছে তাহাদের দমন হয় না। নিজের খাওয়ার উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়।

যাহা-তাহা সাধকের খাইতে হয় না। খাওয়ার দোষে রাজোগুণ তমোগুণ বৃদ্ধি পায়। সাত্ত্বিক ভোজনে সত্য দিকে মন প্রবৃত্ত হয়। যারতার হাতে খাইতে নাই। যারতার বাড়ী যাইতে নাই। সাধক কখনও রাজার দরবারে যাইবে না। বিবাহ উৎসবে, যেখানে বেশী লোকজনের ভীড় সেখানে যাইবে না। যখন সাধন করিবে তখন একাগ্র মনে ঘরের কোণে নির্জ্জনে আসন করিয়া বসিবে। সিদ্ধ আসন খুব ভাল। যাহারা হঠযোগ করে তাহাদের ভগবান লাভ হয় না। ভক্তিযোগে ভগবান লাভ হয়। হঠযোগীরা কিছু সিদ্ধাই পায়, তাহাতে আত্মার উন্নতি নাই। তাহারা কেবল মান্য গণ্য নিয়াই বেড়ায়। লোকের কাছে ধন্য ধন্য হয়। কিন্তু লোকের কাছে ত ধন্য ধন্য হইলে হইবে না। আত্মার যাহাতে উন্নতি হয় ভক্ত সাধক তাহাই চায়। সে লোকের কাছ হইতে নিজেকে লুকাইয়া লয়। যখন সাধকের সাধনা সিদ্ধ হইয়া যায় তখন আর লুকান থাকে না। দুই এক জন ভক্ত আসিয়া জুটে। কিন্তু সে তাহা চায় না। কাহারও কাছে ধরা

ছুঁয়া দিতে ইচ্ছুক হয় না। সে তখন ঠাকুর বলিয়াই আপনা আপনি আনন্দে থাকে। বাহিরের লোক জন ভাল লাগে না। আমার মনে হয় আমি একলাই বেশ থাকি। তোমরা দুই এক জন যা দর্শন করিয়াছ ইহাতে তোমাদের চঞ্চল ভাব থাকা উচিত নয়। কেবল দৃশ্য দেখিলে ত হইবে না, কার্য্যে পরিণত কর মনের চাঞ্চল্য কত দিন থাকে? যতদিন সংসার নিয়া জীব অন্ধ হইয়া থাকে ততদিন সে কিছু দেখিতে পায়না, কাজেই চাঞ্চল্য থাকে। তোমাদের যাহা দর্শন হইতেছে ইহাতে মন স্থির হইয়া যাওয়া উচিত। আবার আমার কোন ভক্ত বলে, মা আমার কিছু হইল না। কিন্তু তাহার মত ত কাহারো দেখিতে পাই না। আমি বলি, বাবা এত আগাছা নয়, এযে মেওয়া গাছ। সবুরে মেওয়া ফলে। শান্ত, স্থির, ধীর পাথরের শিব হইয়া যাও। ভগবান তোমার সহায়। আমি তোমার গুরু, তোমাকে সাধু নাম দিলাম, তুমি সকল রকমই সুফল লাভ করিবে। তুমি আমার ঋষি-যোগীরা যাহা পায় নাই তাহা তুমি পাইয়াছ। মন স্থির করিয়া থাকিবে। বেশী উপবাস করিও না, তাহাতে কঠিন রোগ ধরে, মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন করিতে হয়। রাজসভায় যাইবে না। নিজদেশে তোমার যে পূর্ব্বাশ্রম আছে সেখানে কখন যাইবে না। মনে মাতা পিতার প্রতি ভক্তি রাখিবে। তোমাকে যে আমি মা দিয়াছি এ তোমার মা-ই বটে, তুমি আমার নিমাই, এই তোমার শচীমা, ইহার কাছেই থাক, তোমার উন্নতি সর্ব্বদা হইবে। আমার এখন যে কি হইবে না হইবে বলিতে পারিনা। আমার ইচ্ছা ত

কিছুই নাই, সেই ঠাকুরের ইচ্ছা প্রধান। আমি কি বলিব ? তবে ঠাকুরের এই দেহটা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে, মোটে বল পাই না ত। সেই জন্যই তোমাদের বলিলাম, তুমি এখন কোথাও যাইবে না, তুমি আমার কাছেই থাকিবে। তোমার ভাব আমি দেখিতেছি যোগীদের মত, সেইজন্য তোমাকে আমি ঠাকুরের দেহের কাছেই রাখিব। ভক্ত আর ভগবান এক। তুমি আমার সাধু পুত্র। ভাল জিনিষ কাছে আসিলেই মনে হয় যে তুমি খাও। সর্ব্বদা পরম পিতা ভগবানকে নিয়া আছ তাই থাক। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া থাকিবে। কাহারও কাছে যাচনা করা ভাল নয়। ঠাকুর কিছু দিলে উপেক্ষাও করিবে না। না দিলেও তাহাতে কোন দুঃখ নাই। মান্যগণ্য ভাল জিনিষ নয়, তবে কেহ যদি তোমার কাছে আসে তাহাকে দুই একটী ভাল কথা বলিবে, যাহাতে ভব-সমুদ্র পার হইতে পারে। কখনও বেশী লোক যোগাড় করিও না। নিজের আনন্দে নিজেই থাকিবে। সমতা ভাবই ভাল, বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আকিঞ্চন ভাব নিয়া সদা থাকিও। নিজের ইষ্টনাম জপ করিবে। এই হইল কথা। এই বলিয়া মা একটী গান ধরিলেন।

শুন তারিণী জননী, জগত পালিনী, শিব শক্তি রাণী।
অধম তরাতে, এই অবনীতে, মনফুলে মাগো পূজিমা তোমাকে।
দেমা ভক্তি বারি, শুন মহেশ্বরী, জগত পালিনী অম্বিকে।
দোষগুণ যত, করি অবিরত, ক্ষমা করে মাগো, রাখিবে সতত।
জ্ঞান অজ্ঞানেতে কত করি দোষ, ক্ষমা করে মাতা না করিবে রোষ।

সন্তান তোমার এই মা সতত, রাখ দয়াময়ী চরণে নিয়ত।
ভক্তি নাই মা ঘটে, আছি মা কপটে, বিষয় বাসনা আসে মন তটে
তুমি মা অম্বিকে, জানিয়ে যে সার তবু মাতা আমি না চিনি যে আর।
চরণ তোমার, দেও একবার, ভবরোগ হ'তে করমা উদ্ধার।
ঔষধী মা আছে তোমারি নিকটে, দিয়া মোরে তারা রাখ মা শঙ্কটে।
মায়ারোগ ঘোর স্পর্শে মা অন্তরে, বিবেক বৈরাগ্য দাওমা আমারে।
জয় জয় কালী বলি মা তোমারে মনের কালী মাতা ঘুচাও একেবারে।
বিষের জ্বলনে জ্বলিয়া সংসারে অভয় চরণ দেওমা আমারে।
তুমি মা বরদা বর দিয়ে তায় অধম সন্তানে রাখ মা আমায়।

গান শেষ করিয়া মা বলিলেন গানের মর্ম্ম বুঝিলে কি? মায়ের কাছে এমনি করিয়া সর্ব্বদা যাচ্ঞা করিতে হয়। সর্ব্বদা মনে বল রাখিবে। মন দুর্ব্বল হইলে সাধাকের ক্ষতি হয়। সর্ব্বদা সে শক্তিমানের শরণ লইও, তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে। একনিষ্ঠা ভাব ভাল। এক লক্ষ্য হইয়া থাকিবে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয় ইহা লক্ষ্য রাখিবে। তুমি ত মনে খুব বিচার কর, বিচারটা ভালই। আমি এটা ভাল বুঝি। বিচার না করিলে কি খাঁটি সোনা হওয়া যায়? সোনা পুড়িয়ে পুড়িয়ে তবে খাঁটি করে। তেমনি মনে বিচার করতে করতে তবে মন খাঁটি হয়। মনকে একেবারে জলের মত করিয়া ফেলিবে তবেই মনে কোন রকম গোলমাল হইবে না। এক লাফে ত কেহ উপরে চড়িতে পারে না, একটী একটী করিয়া সিঁড়ি উঠে। তোমরা ত অনেক অগ্রসর

হইয়াছ, যা অল্প আছে শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া যাইবে। মন খুব শক্ত রাখিবে।

(২৪)

পুরুষ মানুষের সাধনার পথে অনেক রকম কণ্টক আসে। সেজন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয় যাহাতে মনের ভিতরও কখন বিষয় বুদ্ধি না হয়। তাহা সর্ব্বদা দরকার। দূর হইতে কোন স্ত্রীলোক দেখিলে প্রণাম করিয়া সরিয়া যাইবে। মাতৃভাব মনে হইলেও সর্ব্বদা তাহা ধারণ করা যায় না। মন বড় পাজী, তাহার সঙ্গে সর্ব্বদা যুদ্ধ করিতে হয়। স্ত্রীলোকের অনেকটা সুবিধা আছে, তাহারা হঠাৎ কোন কাজ করিতে সাহস পায় না। তাহাদের ঘরেই থাকিতে হয়। ঘরের বাহির হইলে নিন্দা হইবে, ভয় হয়। সেজন্য যাহার সুকৃতি আছে সে ঘরে বসিয়া ভগবানের নাম ধ্যান করে। ভগবানই তাহার সহায় হয়।

আমি যখন প্রথম অবস্থায় সাধন করিতাম তখন আমার মনে হইত যে আমি কোন জঙ্গলে যাই। ঘরে থাকিতে ইচ্ছা হইত না। এক এক দিন অস্থির হইয়া বাড়ীর বাহির হইতাম। একদিন চৌষট্টি মায়ের ঘরে গিয়াছি, তিনি আমাকে বলিলেন মা, তুমি ঘরে বসেই সাধন কর। তাহাতেই ভগবান লাভ হইবে। আরও কত কথা আমাকে হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, তাহা সব বুঝিতে পারিলাম না। আমি তখন ঘরে আসিলাম, আসিয়া নিজের আসনে বসিলাম। তখন ঠাকুর আমাকে বলিলেন, তুমি কেন বনে যাইবে? কলিতে বনে কিছু নাই। মনকে যতক্ষণ বন

না বনান যায় ততক্ষণ বনে গিয়া ও কিছু হয় না। তুমি ত মনকে বন বানাইয়াছ, আর বনে যাওয়ার দরকার নাই। দেখ না কতগুলি লোক বনে থাকে আর ছাই ভস্ম মাখে, আর লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার জন্য আসে, বলে আমি বনবাসী, আমাদের ভিক্ষা না দিলে গৃহস্থদের মঙ্গল হইবে না। আমি ভাবলাম তাই ত, ঠাকুর ত ঠিক বলিয়াছেন। তখন আমার বনে যাওয়ার মন ফিরিয়া গেল। সেইজন্য তোমাকে বলিতেছি বনে যাওয়ার মনস্থ করিও না। বনে বহু হিংস্র জন্তু আছে। কলিতে বনে কিছু হয় না। যখন তুমি সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছ, যাহাতে নিজের উন্নতি করিতে পার তাহাই করিবে। লোকের কাছে ত নাম ফলালে কোন ফল হয় না। নিজের ভিতর যাহাতে সুফল ফলে তাহাই করিবে। একেবারে প্রস্তরের শিব হইয়া যাও। ভিতরে কেমন সুন্দর শিব আছে দেখিতে পাইবে। সংসার অসার এটা সর্ব্বদাই জানিবে। সারবস্তু সেই ভগবান। কাহারও সঙ্গে বেশী বাক্যালাপ ভাল নয়। তবে যদি কেহ ভক্ত হয় তোমার মনে কোন খুঁটিনাটি থাকিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। মনের সন্ন্যাসই সন্ন্যাস। দেখ কত লোক সন্ন্যাসী হইয়াছে, তাহাতে তাদের কি হইল? যখন সন্ন্যাসের যোগ্য হয় তখন ঠাকুরই সন্ন্যাস দেন। আমাকে ঠাকুর নিজেই সন্ন্যাস দিয়াছিলেন। আমি কাহারও কাছে সন্ন্যাস নেই নাই। আমার যখন পতিবিয়োগ হইল তার কিছুদিন পর ঠাকুর একখানি গেরুয়া বস্ত্র হাতে করিয়া বলিলেন এই বস্ত্রখানি তুমি পর। আমি

বলিলাম কেন? তিনি বলিলেন তুমি যে সন্ন্যাসী, তোমার মন সন্ন্যাস হইয়া গিয়াছে। আজ হইতে তুমি পরম ব্রহ্ম হইলে। সন্ন্যাসীরা পরম ব্রহ্ম হয়। তাহাদের কিছু লোকাচার থাকে না। তুমি ত অনেক দিন হইতে সন্ন্যাসী হইয়াছিলে, তবে এতদিন যে আমি তোমাকে এই বস্ত্র দেই নাই তার কারণ তোমার জাগতিক পতি ছিল। এখন মা তুমি এই কাপড়ই পরিবে। আমি তোমাকে সন্ন্যাস দিলাম। এই বলিয়া ঠাকুর কতগুলি ব্রহ্মমন্ত্রের বীজ আমার কানে বলিয়া দিলেন। আমার যখন অল্প বয়স তখন আমি কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়াছিলাম, সেই মন্ত্র নিয়া সর্ব্বদা জপ ধ্যান করিতাম। তখনওআমার অল্প অল্প দর্শন হইত। তবে তখন আমার নিয়ম ছিল যে কাশীতে আসিয়া গুরু পূজা না করিয়া জল খাইতাম না। যে দিন আমার গুরুমা প্রাতে আমার খালিসপুরার বাড়ীতে আসিতেন সেদিন সকালে সকালেই পূজা হইয়া যাইত। আর তাহা না হইলে চারটা পাঁচটা বাজিয়া যাইত তখন পূজা করিতাম তাঁহাকে মিষ্টি ও পয়সা দিয়া। গুরুর প্রসাদ ছাড়া খাইতাম না। কিছু না কিছু প্রসাদ লইয়া আসিতাম। গুরুভক্তি আগে চাই, মন্ত্র লইতে লইতেই আমার এই জ্ঞান হইয়াছিল। পরে যখন আমার সাধনার উন্নতি হইতে লাগিল তখন আমার গুরুমা আমাকে বলিতেন, তুমি এত দর্শন পাইতেছ আমাকে কিছু দেখাও। তখন ঠাকুরের কৃপায় আমার গুরুমা অনেক দর্শন পাইলেন, পাইয়া সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন, তুমি ভগবানের

পরমভক্ত, তোমার জন্য আমিও ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম। আমি গুরুমায়ের বাড়ী যখন থাকি তখনই লীলা আরম্ভ হয়। তাহাতে ব্রজের গোষ্ঠ লীলা, বনবিহার, মুনি পত্নীদের কাছে গোপালের ভোজন, কালিয়দমন, ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ, রাধার কলঙ্ক ভঞ্জন, সুবলমিলন, রাসলীলা, গোবর্দ্ধনধারণ, রাধার মান ভঞ্জন, ধেনুকাদি অসুর বধ, পূতনা বধ, উদ্‌খল ভাঙ্গা, ননীচুরী করা, যশোদার তাহাতে তাড়না, যশোদাকে বিশ্বরূপ দর্শন, ঠাকুরের মাখন মাটি খাওয়া, কংস-বধ, মথুরায় রাজা হওয়া। কুব্জা যে ঠাকুরকে চন্দন পরাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়া আমার খুব হাসি আসিল। ঠাকুর বলিলেন, হাসিতেছ কেন? এ রাম জন্মে আমাকে চাহিয়াছিল কিনা, এজন্য এজন্মে ওর মালা চন্দন নিলাম।

ঠাকুরের ব্রজলীলা যত কিছু আছে সকলই দেখিয়াছি, তবে গোপীদের বিরহ দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। ঠাকুর বলিলেন যে এইজন্য দুঃখিত হইতেছ কেন? ভক্তের বিরহ হওয়া চাই। যখন উদ্ধব আসিয়া গোপীদের যোগজ্ঞান দেন তাহাতে গোপীদের খুব জ্ঞান হইল এবং তাঁহারা দিব্যজ্ঞানে অভিভূত হইয়া ঠাকুরের ধ্যানে মগ্ন হইলেন। পরে প্রবাসে গিয়া আবার ঠাকুরের সঙ্গে মিলন হইল। দ্বারকালীলা দেখিয়া আমার বেশী আনন্দ হইল না। ঠাকুরকে বলিলাম, তুমি যে রাজ সিংহাসনে আসিয়াছ গোপীদের কি ভুলে গিয়াছ? ঠাকুর বলিল না, না, তাহাদের আমি ভুলি নাই। ভক্তের হৃদয়ে আমি সর্ব্বদাই থাকি, তাহাদের সঙ্গ ছাড়া আমি কখনও থাকি না। ব্রজলীলা দর্শন

আমার দুই বৎসর হইয়াছে। তখনই নাম ও বীজমন্ত্র অনেক কায়া হইতে বাহির হইয়াছে কিংবা গায়ে ফুটিয়াছে। তখন কোন ভক্ত ওসব দেখিয়া তাহার কতক অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছে। আমার মন তখন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিত, ভাবিতাম এই বুঝি দর্শনের শেষ। ঠাকুর বলিলেন, না আরও কত দেখিবে, এখন কি হইয়াছে? পরে একটী গান গাহিলেন :—

আমি ব্রজ সুন্দর ব্রজ হয় মধুর,
বিশাখা ললিতা সখী তায়।
রাধাকে লইয়া বামে, থাকি আমি সর্ব্বক্ষণে
সুন্দর যে হেরে ভক্তজন।
আমি গোপীবল্লভ, গোপীগণ হয় সব,
বৃন্দাবন বৃন্দার কারণ।
বিন্দা দূতি সখী আছে, দূতিকর্ম্ম করে বসে,
পূর্ণমাসী আছে গো তথায়।
যোগমায়া যোগ করি, হৃদয়ে আমায় ধরি,
মায়াচক্র না করে হেথায়।
এই যে মধুর বৃন্দাবন, হয় মোর মন প্রাণ,
গোপাল গোবিন্দ নাম দেয়।
যশোদা নন্দের কাছে, গোপাল বেশেতে হেসে,
থাকি আমি তাদের কোলেতে।
যত গোপাঙ্গনা মোর, গোবিন্দ মায়ায় ঘোর,
গোপীগণ প্রাণ-মন মোর।

না চাহে সংসার তারা, নাহি জানে আমি ছাড়া,
করে সবে আরতি আমার।
মন পুষ্পে ভক্তি করে, মন প্রাণ দেয় মোরে
প্রেম করে আমার লাগিয়া।
আমি ত প্রেমিক হয়ে, রাস করি তাদের লয়ে,
নাম রাখে রাসবিহারী মোর।
রাধাকে যে অঙ্গে ধরি, বাজাই রাধা বাঁশরী,
বাজে খনে খনে রাধা সুর।

গান শেষ করিয়া ঠাকুর মাকে বলিলেন, ব্রজের প্রেম শুনিলে ত? আমি কখনও ব্রজ ছাড়া হই না।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিতরের তত্ত্ব না জানা যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বাহিরের অনুষ্ঠান নিয়া থাকিতে হয়। বাহিরে দর্শন ও ফুলপাতা ভোগরাগ নৈবেদ্য দিয়া নিজের ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়, তিথি মাহাত্ম্যে গঙ্গা স্নান করিতে হয় এবং নিয়ম করিয়া লইতে হয় যে অমুক সময় আমি ধ্যান করিব এবং এত জপ করিব। নিয়ম বাঁধা না হইলে পরে ধ্যান জপ ঠিক হয় না, যে দিন তাহা না করিবে সেদিন মনে খুব আক্ষেপ নিবে এবং জরিমানা স্বরূপ এক হাজার জপ বেশী করিবে। ধ্যান জপ করবার সময় অন্য কোন চিন্তা আনিবে না, যদি কোন প্রকারে আসে তাহা হইলে নিজের ইষ্ট দেবতার কাছে খুব কাঁদিবে। যেমন তোমরা আপনার লোককে নিয়া কথা কও, তখন যদি কেহ আসে তাহা হইলে ত বিরক্তি মনে কর।

তেমনি জপ ধ্যানের সময় ভগবান আপন জন, সেই সময় অন্য চিন্তা আসিলে ব্যাঘাত ঘটে, সেজন্য প্রাণ মন দিয়া নিজের ইষ্ট-মূর্ত্তি চিন্তা করিতে হয়। যেমন সাঁপুড়েরা সাপের মন্ত্র পড়ে তাহাতে কিছুই তাহাদের হয় না, কেবল বিষধর সর্পই আসে, তেমনি তোমরা যদি ভগবানের নাম করিতে করিতে সংসারের চিন্তা আন তাহা হইলে সেই সংসারের বিষগুলি আসিয়া তোমাদের দেহ ও মন হরণ করিয়া লইবে। ধ্যান করিবার সময় ভগবানের রূপ মনে মনে অঙ্কিত করিয়া হৃদয়পদ্মে স্থাপন করিতে হয়। জপের সময় তাঁহার চরণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জপ করিতে হয়। তোমরা বলিতেছ যে মা তাহাত পারি না, এইটা হইতেছে মিথ্যা কথা। পারি না এমন কোন কথাই নাই। মানুষ সবই পারে। মানুষ হওয়া চাই। পশু হইলে সে কিছুই পারে না। মানুষের অসাধ্য কি আছে? এই যে সব মহাপুরুষেরা ছিলেন তাঁহারা কি এক লাফেই মহাপুরুষ হইয়াছিলেন? তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবানের জন্য ব্যাকুল ছিলেন, তবে ত ভগবান দয়া করিয়াছেন! তবেত মহাপুরুষ হইয়াছেন? সর্ব্বদা সংসারের মধ্যে থাকিয়াও ত্যাগ নিতে হইবে। ত্যাগী না হইলে সাধন ভজন হয় না। সংসারে বিষ্ঠার মধ্যে থাকিয়া যদি মুখ থুবরে থাক তাহা হইলে সে বিষ্ঠার গন্ধই পাইবে। সেখানে কি ফুলের গন্ধ আসে? কোন প্রকারে একটু সুগন্ধ থাকিলেও সেই দুর্গন্ধে সুগন্ধ ও টের পাওয়া যায় না। সেজন্য দুর্গন্ধ হইতে ফুল-বাগানে যাইতে হয়। সে ফুল-বাগান হইতেছে

ভগবানের নাম ও ধ্যান এবং তাহার সঙ্গে বিবেক আর বৈরাগ্য ত্যাগ না হইলে পরে বিবেক বৈরাগ্য আসে না। সর্ব্বদা আকুল হইয়া ভগবানকে ডাক, ডাকিতে ডাকিতে মন স্থির হইয়া যাইবে। প্রাণ মন খুলিয়া তাঁহার চরণে শরণ লও। সকলেরই ত একদিন যাইতে হইবে, এইটা সর্ব্বদা মনে ধারণা কর। বাঁদরের কিচিমিচিরে আর থাকিও না। বাঁদর হইতেছে সংসারের এই ছেলে মেয়েগুলি, কেউ করিতেছে চেঁ, কেউ করিতেছে ভেঁ, কেউ করিতেছে মেঁ। সে সব যে এত ভাল লাগে তাহা আর বলিতে পারিনা। ওরে, সংসারে ত নগ্ন আসিয়াছ, নগ্নই চলিয়া যাইবি। সে সময় একখানা ভাল কাপড় ও দিবে না। সেইজন্য নিজের পথ নিজে দেখিতে হয়। শিয়রে একটী শ্মশান বানিয়ে রাখিতে হয়। তাহা হইলে সর্ব্বদা স্মৃতি থাকিবে যে এই শ্মশানে আমাকে পুড়িতে হইবে। সে শ্মশানে ইন্ধন দিতে হয়। জ্ঞান বৈরাগ্য হইতেছে ইন্ধন, আর শ্মশান গুরুর নাম ও ধ্যান। তাহাতেই মন স্থির হইয়া যায়। নিজের ইষ্ট দেবতা যিনি শক্তি তিনি শ্মশান ভাল বাসেন কিনা, সেইজন্য শ্মশান হৃদয় করিয়া ধ্যানে বসিতে হয়, তাহা হইলে মা খুব নাচিয়া নাচিয়া হৃদয়ে আসেন। শ্মশান হইলে আর অন্য চিন্তা আসে না। বৈষ্ণব আর শাক্ত বলিয়া কোন কথা নাই, শক্তি ও শক্তিমান একই। মনে দ্বিধা রাখিতে নাই। ভগবান আর ভগবতী দেখ সমান অক্ষরেরই নাম, সেজন্য যাহারা দ্বিধা করে তাদের পরম ভক্তি হয় না। ভগবান ছাড়া কোন জায়গা দেখা যায় না এবং ভগবতী ছাড়াও কোনও জায়গা

নাই। সেইজন্য প্রথম থাকিয়াই মায়ের আরাধনা করিতে হয়। মা সন্তুষ্ট হইলে শক্তিমানের সঙ্গে মিশাইয়া দেন, এই সমস্ত আমি অনুভব করিয়াছি, তাই কিঞ্চিৎ তোমাদের বলিতেছি। সর্ব্বদা সংসার হইতে মন সরাইবার চেষ্টা কর। সংসারে আছ থাক, তাহতে ক্ষতি নেই, পৃথক হইয়া থাকিতে হয়। জলে নামিলেও যেন কাপড় না ভিজে এই চেষ্টা করিতে হয়। মায়ামোহ জল, সেখানে একেবারে দেহটাকে ডুবাইয়া দিও না। মনটাকে কাপড় করিয়া রাখ, তাহা হইলে ভিজতে পারবে না। ত্যাগ ত একদিনে হয় না, একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া দাও। ঘর পোড়া গরুর মত হাম্বা হাম্বা করে ডাক। তাহা হইলে ভগবান আসিয়া সংসারের অগ্নি নিবাইয়া কোলে তুলিয়া নিবেন। ভগবান হইতেছেন চিন্ময় মহাপুরুষ। দেখিতে অতি সুন্দর, সাধন করিতে করিতে তবে দেখা যায়। তাঁহার যে কিরূপ তাহা বর্ণনা করিতে পারি না, চক্ষু ঝলসিয়া যায়। কর্ণ বধির হইয়া যায়। বাহিরের শব্দ কিছু শুনা যায় না। ভিতরে নানা রকম ধ্বনি হয়। তাহা শুনিতে শুনিতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। তাঁহার রূপ দেখিতে দেখিতে চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়ে। মনের চাঞ্চল্য সব কাটিয়া যায়। তোমরা বলিতেছ যে মা কি করিয়া হইবে? একদিনে কিছু হয় না। মনটাকে একবার ঠিক করিয়া তাহাকে ডাক, তবে ত দেখিতে পাইবে। আর ডাকিতে ডাকিতে তাঁর সাড়াও পাইবে। শুধু শুধু মে মে করিলে কি হইবে? ভাল করিয়া একবার তাঁর দিকে মন দিবে, তবে আনন্দ আসিবে। পরম

পিতা সেই ভগবান। তিনি কি কখন ভক্তের কষ্ট দেখিতে পারেন? ভক্ত যাহাতে সুখী হয় তিনি তাহাই করেন। মানব জন্ম দুর্ল্লভ জন্ম। এমন জন্ম পাইয়া মানুষগুলি কেবল মিছে মায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই দেহটা ত আজ আছে কাল নাই, ক্ষণস্থায়ী। সেইজন্য প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা, শঠতা এই সব ছাই-ভস্ম নিয়া কেবল আমার আমার করিয়া মরে। যখন শ্মশানে যায় তখন বলে হায় হায়, আমাকেও ত যাইতে হইবে। শ্মশান-বৈরাগ্যে কোন কাজ হয় না। রাস্তায় আসিতে আসিতেই আবার ভুল। বাড়ী আসিয়াই অমনি কোমর বাধিয়া ঝগড়া করিতে বসিল, বলিল, আমার মত কে আছে? আমি ভাল মানুষ বলিয়া তোমরা এত বলিয়া নিতেছ। এই রকম ত সংসারটা। দেখিয়া দেখিয়া ঘৃণা লাগে। ভগবানের নামে ঝুঠাও ভাল। ভগবানের নাম কেহ সত্যভাবে, কেহ কপটভাবে বলে। নাম কীর্ত্তন কেহ মন-প্রাণ দিয়া করে, কেহ এমনি করে। তবে প্রাণ দিয়া না করিলে তাঁহার নাম হইতেছে ঝুঠা। সেই জন্য বলিলাম, ভগবানের নাম যদি কেহ মিথ্যা ভাবে করে তাহাও ভাল। প্রাণ-মন দিয়া নাম করিলেই সেইটা সত্যনাম হয়। সত্যের সঙ্গে সত্য-ভাবেই চলা ভাল। পরম সত্য ভগবান। তাঁহার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিলে নিজে প্রবঞ্চিত হইতে হয়। তাঁহার অন্তরদৃষ্টি আছে। অন্তরের ভাবভঙ্গি তিনি সবই জানেন। মা বলিলেন, শুন একটি কথা :—

মাতা পিতা ভাই ভগ্নী কেহ কারো নয়,
পথিকের সঙ্গে যেন হয় পরিচয়।

সর্ব্বরূপে সার যদি করিবে তাহারে,
ভগবান কৃষ্ণরূপে আসেন অন্তরে।
মায়া মোহ সুখ দুঃখ সকল ত্যাজিয়া,
শরণ লও না জীব একাগ্র হইয়া।
পূর্ণ করেন ভগবান ভবার্ণবে আসি,
ঘুচাইয়া দেন তার যত দুঃখ রাশি।
ত্যাগ কর মান অভিমান ছাড় অহঙ্কার,
কাম ক্রোধ দুটা রিপু করনা সংহার।
জ্ঞান-খড়্গ ধর জীব আপনার করে,
খড়্গাঘাতে খণ্ড খণ্ড কর না দুটারে ?
লোভ মোহ ত্যাগ করি ভজ নারায়ণ,
নিদ্রাহার মৈথুনে দিও না আর মন।
পুরুষ হইলে নারী স্পর্শ না করিবে,
কামিনী ও নিজপতি অঙ্গ না ছুঁইবে।
চরণ সেবিবে নারী পতিব্রতা হলে,
অচলা ভকতি নেবে ভগবান বলে।
সংসারে অসার বস্তু কামের কামনা,
মায়া মোহ অন্ধকারে হারায় আপনা।
আপন পুরুষোত্তম সেই নারায়ণ,
জানিয়া শুনিয়া জীব ভজে না কখন।
ছি ছি বলি ধিক্কার দেই মানবগণে,
মানুষ হইয়া হুঁস্ থাকে না যে জনে।

অন্ধপ্রায় থাকে তারা ভুলিয়া মায়ায়,
সযতনে নাহি চায় আপনার মায়।
আছেন ইষ্টদেবী মাতা অন্তর ভিতরে,
খুঁজিলে দেখিতে পায় আছেন যে ঘরে।
যাহার যেরূপ ভাব সেই ভাবে থাক,
সুখ দুঃখ ভুলে গিয়ে ভগবানকে ডাক।

দেখ, সকল সময় তুমি যে জ্যোতি দেখিতে পাইতেছ ইহা হইতেছে পরম পদের লক্ষণ। তবে তোমার একটু আবরণ আছে, সেজন্যই পূর্ণভাবে দেখিতে পাইতেছ না। আর ঐ যে নয়ন দুইটী দেখিতেছ ঐ দুইটী ভগবানের চক্ষু, ঐ চক্ষু দ্বারা তোমার সমস্ত দোষগুণ ভগবান দেখিয়া লইতেছেন। তুমি আমার শিষ্য, তোমাকে আমি খাঁটি সোনা করিয়া লইব। তোমার পূর্ব্বার্জ্জিত সাধনা ছিল, সামান্য দোষে তোমার সিদ্ধিলাভ হয় নাই, এই জন্মে তোমার সমস্ত পূর্ণ করিয়া দিব। তোমার ভিতরে অনেক রকম বাণী হইতেছে, তাহা তুমি উপেক্ষা করিতেছ। মধ্যে মধ্যে তোমার কান বধির হইয়া যাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে তুমি ব্রহ্মশব্দ পাইতেছ। তাহাতে তোমার মন ঠিক হয় না কেন? তোমার ত অনেক রকম দর্শন হইয়া গেল, তুমি কত রকম লীলা দেখিয়াছ, তাহা সব উপেক্ষা করিয়াছ। তুমি ব্রহ্মপদে স্থিত হইয়াছ, তবে তোমার মনটা এখনও একটু চঞ্চল আছে। সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা ত তুমি জান। আপন মন সন্ন্যাস করিয়া লও।

এইটাতে যদি তুমি ভাল বোধ কর তাহা হইলে করিতে পার, বেশী বাড়াবাড়ি করিতে নাই। আমি এসব ভাল বুঝি না।

ব্রহ্ম নারায়ণ, লও তাঁরি শরণ,
ব্রহ্মময়ী আমি নারায়ণী।
কানেতে ফুকারি মন্ত্র, শিখাই যে নানা যন্ত্র,
ওঁকার শুনিতে পাও ধ্বনি।
ব্রহ্ম মন্ত্র দেই তোরে, সন্ন্যাসেতে কিবা করে,
নাশ কর নিজের যে মন।
নিজ দেশে নাহি যাবে, নারী নাম নাহি লবে,
কাঞ্চনেতে কিবা প্রয়োজন ?
খেতে শুতে দেখতে পাও চরণের বাহার,
নীল জ্যোতি প্রভা আছে সমতা তাহার।
শ্বেত রং সূর্য্য দেখ হৃদয়-আকাশে,
তোমার হৃদয়ে তথা আমি আছি বসে।
সিদ্ধিমাতা বুদ্ধিদাতা আমিই তোমার,
এস পুত্র কোলে লই তোমায় এইবার।
সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী আছ দিবানিশি,
একাগ্র মনেতে তুমি থাক দেখি ঋষি।
যোগী ঋষি পায় না ধ্যানে যে ধন কখন,
সে ধন পেয়েছ বাছা তুমি সর্ব্বক্ষণ।
দেখিয়াছ গোবর্দ্ধন গিরির উপরে,
আকাশ ছাইয়া জ্যোতি দেখায়েছি তোরে।

বিশ্বাস না ছিল তোর নিজের অন্তরে,
সেজন্যেতে স্থূলে তোরে দেখাইনু পরে।
আজিও দেখিছ জ্যোতি নিজের ভিতর,
শ্বেতবর্ণ প্রভা আছে তাহার উপর।
শ্বেত প্রভা দেখ বাছা যখন তখন,
পরম পদের আভাস জানিবে কারণ।
মনবুদ্ধি স্থির করে নিজের অন্তরে,
সর্ব্বদাই ভক্তিমার্গ ধর একেবারে।
শত শত লীলা তব অন্তরে দর্শন,
উপেক্ষা করিয়া তুমি ধ্যানেতে মগন।
দোলপূর্ণিমার দিন সন্ধ্যায় যখন,
ধ্যান যোগে ছিলে তুমি করিয়া শয়ন।
সে সময়ে দেখিয়াছ গোবিন্দের লীলা,
দোল খেলা মহারাস দেখিয়াছ মেলা।
তব মাতা তরুদেবী গেছিল দর্শনে,
আসিয়া ডাকিল তোমা নিদ্রার কারণে।
তখনও ত তুমি বাছা মাতালের প্রায়,
ভাবেতে মগন কায় দেখিনু তোমায়।
সুন্দর যে দেখিয়াছ বর্ণিব কি আমি,
মা মা বলে উচ্চস্বরে ডাকিলে যে তুমি।
"মা" বলাতে তরু তোমায় দিল ত উত্তর,
পরেতে বুঝিতে পেরে হ'ল স্বতন্তর।

আমি সিদ্ধিমাতা তব সর্ব্বক্ষণ দেখি,
সাধন করিছ দেখে হয়ে থাকি সুখী।
মনের বাসনা তোমার পরিপূর্ণ হবে,
সাধন সমাপ্তি করে পরমধামে যাবে।
কিছুদিন থাক বাছা সংসারে এখন,
অনিত্য বাসনা তব না হবে কখন।
মায়া মোহ লোভ যত করেছ বর্জ্জন,
দেখিয়াছি স্থূল কায়ে আমি ত তখন।
এখনো সূক্ষ্ম কায়ে দেখতে পাই আমি,
অসাধ্য সাধন পুত্র করিতেছ তুমি।
আপন মনে থাকো তুমি নির্জ্জন কাননে,
মনহারা হয়ে থাক নারায়ণ সনে।
আশীর্ব্বাদ করি তোরে দিয়ে এই কর,
অভীষ্ট পূরণ তোর হইবে সত্বর।

(২৬)

কাশীতে সর্ব্বত্রই বিশ্বনাথ দেখিতে লাগিলাম। এখানে শিব ছাড়া আর কিছুই নাই। কোথাও পা ফেলিতে ইচ্ছা হয় না। তখন প্রভুকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন, ভয় কি? তোমার চরণ ব্রহ্মরূপ, বহুলোক এ চরণ সেবার জন্য আসে। আমি আরও দেখিলাম কাশীপুরী সুবর্ণময়, মণি-কর্ণিকায় স্বর্গপাট। কাশী ত্রিশূল-উপরে, গঙ্গা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি।

মহাযোগী শিব সেখানে বসিয়া সকল কাশী-প্রাপ্ত জীবের কানে তারক ব্রহ্ম রাম নাম দেন। নিজের চক্ষে দেখিলাম, কাশী লাভ করিয়া জীবগণ দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক শিব হইতেছে। স্বর্ণময় পুরীতে মা অন্নপূর্ণা স্বর্ণপাত্রে অন্ন রাখিয়া সকলকে অন্ন দেন, কেহ অভুক্ত থাকে না। অর্দ্ধরাত্রে এক ক্ষুধার্ত্ত পথিক ঘাটের ধারে বসিয়াছিল, মা অন্নপূর্ণা তাহাকে ভোজন করাইলেন, আমি দেখিয়াছি। কাল-ভৈরব পাঁজিপুঁথি হাতে করিয়া বিচার করেন এবং দণ্ডপাণি হইয়া দণ্ডের বিধান করেন।

বিশ্বনাথ বলিলেন, কাশীধামে আসিয়া যাহারা নানারূপ পাপাচরণ করে আমি তাহাদিগকে কালভৈরব হইয়া তাড়না করি।

পাপ কর্ম্ম করে সদা পরনারী হরে,
প্রতিগ্রহ করে সবে আকিঞ্চন ভরে।
চুরি করিতে তাদের মনে নাহি ভয়,
হিংসা দ্বেষ অহঙ্কারে পূর্ণ হয়ে রয়।
দুষ্ট জনে শ্রদ্ধা করে, শিষ্টের নিন্দুক,
সাধুদের প্রতি হিংসা ধর্ম্মেতে বিমুখ।
কাল-ভৈরব হয়ে আমি তাড়না করিয়া,
বিচার করিয়া লই দেখ নিরখিয়া।
কাশীতে থাকিবে যে বা কাশীবাসী হবে,
সর্ব্বদা নির্ম্মল হয়ে জ্ঞান ত লইবে।
সে সকল জীব তবে মুক্ত হয়ে যায়,
কাশীর বৃত্তান্ত মাতা বলি গো তোমায়।

মা বলিলেন, যে কাশী নিন্দা করে আমি তাহাকে দেখিতে পারি না। দেখিলাম, সুন্দর কাশীধাম শিবময়, সব নারী অন্নপূর্ণা, কাশীর মাহাত্ম জানিয়া কাশীর শরণ লইয়াছি। কাশীতে সাধন করিয়া সফল হইলাম। পরমগুরু হর-হরির সাক্ষাৎ দর্শন পাইলাম।

বার বৎসর বয়সে ভগবান বিশ্বনাথের কৃপায় জ্ঞানের উদয় হয়, তিনি আমায় বলেন, ২৪ বৎসর বয়সে তুমি কাশী যাইবে, সেইখানে তোমার সাধনার ফল প্রকাশ পাইবে, কাশীধাম তোমার আপনার স্থান। ৫৫ বৎসরে তোমার সাধনার সমাপ্তি হইবে। তখন চতুর্ভুজ শ্রীহরি তোমায় ডাকিয়া বলিবেন, 'সাধনা সমাপ্তি', ও 'পরম পদে স্থিতি'। তখন তোমার নিজ অঙ্গে অক্ষর ফুটিয়া উঠিবে। সাধন সমাপ্তি তিনবার। তখন তুমি সাধনা সমাপ্ত করিবে। তারপর কিছু দিন কাশীতে বাস করিয়া স্বধামে চলিয়া যাইবে। তোমার স্বধাম পরম পদ।

বাল্যকাল হতে আমি শুনতে পাই ধ্বনি,
ঠাকুরের কথা তাহা তখন নাহি জানি।
পরে মোরে সাক্ষাৎ যে প্রভু নারায়ণ,
সকল শিখায়ে মোরে দিলেন তখন।
জ্ঞানের ভাণ্ডার প্রভু দিয়া জ্ঞান দান,
পূর্ণরূপে করিলেন অভীষ্ট বিধান।
শূণ্য মন শূণ্য প্রাণ করিয়ে ঠাকুর,
চতুর্ভুজরূপে মোর হৃদয়ে প্রচুর।

দেখিয়াছি মহাজ্যোতি মহামিলনেতে,
সর্ব্বচক্র জ্যোতির্ম্ময় দেখিনু তাহাতে।
জ্যোতি ছাড়া আর কিছু দেখিতে না পাই,
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ গুরু দেখি সর্ব্ব গায়।
হরি হর এক হয়ে অঙ্গেতে মিশায়,
দুলিয়া দুলিয়া সদা থাকে ত হিয়ায়।
এ কায়াটা দোলে মোর ঠাকুর দুলিতে,
কায়া যে শীতল হ'ল তাঁদের স্পর্শেতে।
সর্ব্বদা দেখিতে পাই লীলা খেলা যত,
নৃত্য করে গৌর রায় নিরখি সতত।
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে নাচিয়া নাচিয়া,
হরি নাম করে প্রভু আকিঞ্চন হইয়া।
ব্যাসদেব নারদাদি সিদ্ধ ঋষিগণ,
আসিতেন সকলে দেখিতে সংকীর্ত্তন।

সকলেই বলে মাতা, তুমি যে জননী হেথা,
ধন্য ব্রহ্মময়ী তুমি ভুবন মাঝারে,
পূর্ণ ব্রহ্মরূপ তুমি হয়েছ সংসারে।
দেবগণ করে স্তুতি, কর জোড় স্তুতি নতি,
সিদ্ধিমাতা বুদ্ধিদাতা হও মা শঙ্করী।
জ্ঞানের ভাণ্ডার মাতা, জ্ঞানময় হও পিতা,
আদ্যা শক্তি তুমি নারায়ণী।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডচয়, চরণে উদ্ভব হয়,
সেই প্রভু তোমার অঙ্গেতে।
নারদাদি সপ্ত ঋষি, গোলোক বৈকুণ্ঠ-বাসী,
সপ্তপুর তোমার মধ্যেতে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, জননী তুমি সাকারা,
নিরাকারা মহা জ্যোতির্ম্ময়।
পুরুষ প্রকৃতি ধরি, নারী রূপে তুমি হরি,
ইন্দ্র চন্দ্র বরুনাদি ব্রহ্মাণ্ড নিচয়।
নাশিবারে ভব ভয়, তুমি সুরেশ্বরী হও,
প্রভা হয় দেখিতে সুন্দর।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম, অঙ্গেতে যে শোভা পান,
দেখিতেছি আমরা নিয়ত।
বিষ্ণু চক্র ধরি হরি, রয়েছেন অঙ্গ জুড়ি,
প্রণমি মা, তাই অবিরত।
ভক্তি লইয়া মাতা, জন্মিয়াছ তুমি হেথা,
ধন্য তব পতি পিতা মাতা।
তোমার ভক্তিতে সবে উদ্ধারিলে তুমি,
আপনার কায়াতে মাতা জগতের স্বামী।
সর্ব্বরূপে তব অঙ্গ অতি শোভা পায়,
সেই হেতু প্রণমি মা, তব পদ্ম পায়।

এই রকম করিয়া দেবতারা আমার স্তব করিলেন, পরে আমার ভয় হইল। তখন আমি ঠাকুরকে বলিলাম, "ও ঠাকুর, এ আবার কি

হইল ? দেবতারা আমাকে এ রকম করিয়া স্তব করে কেন ? আমি এ সব সহ্য করিতে পারিব না " তখন ঠাকুর আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভক্তের মান আমি বাড়াই। তোমাকে স্তব করাতে আমাকে স্তব করা হইতেছে, তাহাতে তোমার ভয় কি ?"

গান :— ভক্ত আমার প্রাণ মণ, ভক্ত আমার জীবন,
ভক্তের সঙ্গ আমার সঙ্গ, ভক্ত আমার প্রাণধন।
ভক্ত ছাড়া হ'লে পরে, আমার মন যে কেমন করে।
তাই ভালবাসি তারে, রাখি করি সদা যতন।
ভক্তের মান্যে আমার মান্য, ভক্তকে যে করি ধন্য,
ভক্তের প্রেমে হইয়ে হারা, ভক্ত আমার নয়ন তারা,
ভক্তের কাছে দেই যে সাড়া, না হই বধির কখন।

(২৭)

সাধন সময়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি উপদেশ দেন ও আমার কাছ হইতে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে কিছু দিন আমি হঠযোগী হইয়া সাধন করিয়াছি, কিন্তু রস পাই নাই। বহুকাল এইভাবে চলিয়া গিয়াছে। তারপর মা দেহরক্ষার সময় আমার ব্রহ্মজ্ঞান আসিল। তারপর অল্পদিন ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ধ্যানযোগে পরম ব্রহ্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছি। তোমাকে দেখিয়া আনন্দলাভ হইয়াছে। কিছু জীব উদ্ধার হইবে। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনিও আমায় প্রণাম করিলেন। পর পর অনেক

মহাত্মাদের সঙ্গে দেখা হইতে লাগিল। পরমহংসদেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রায়ই আসা যাওয়া ছিল। তাঁহারা আমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। ভাস্করানন্দ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য মহাপ্রভু, বুদ্ধদেব ইহাদেরও দর্শন পাইয়াছি ও বহু কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা কত বলিব। যোগশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা শঙ্করাচার্য্য আমায় দিয়াছেন। তবে মনে কোন তর্ক বিতর্ক উঠিলে পরমহংসদেব ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে মীমাংসা করিতাম। তাঁহারা সর্ব্বদাই আমার কাছে কাছে থাকিতেন। অনেক মহাপুরুষ আসিয়াছেন, সকলের নাম আমার মনে নাই। সপ্তঋষি, নারদ, শুকদেব প্রভৃতি মুনি ঋষিদের দর্শন পাইয়াছি। শুকদেবকে সময় সময় কোলে বসাইয়াও লইয়াছি। শুকদেব পরম পদ লাভ করিয়াছেন আমি দেখিয়াছি। ধ্রুব, প্রহ্লাদ দুইটি বালক নাচিয়া নাচিয়া গান করিত। তবে ধ্রুব হইতে প্রহ্লাদের উচ্চ অবস্থা দেখিয়াছি। চৈতন্য মহাপ্রভু দল বল নিয়া আমার এখানে কীর্ত্তন করিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রেমেতে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া যাইত। তাঁহার প্রেমে প্রেমিক হইয়া থাকিতে হইবে। প্রেম শিখিতে হইবে তাঁহার কাছে, ত্যাগ শিখিতে হইবে পরমহংসদেবের কাছে, যোগ শিখিতে হইবে শিবের কাছে, জ্ঞান শিখিতে হইবে মহাদেবের কাছে, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে শুকদেবের কাছে। শুকদেব বিবেকী, জন্ম হইতে মায়া মোহ হীন, তাঁহার মূর্ত্তি সুন্দর, যুবক অবস্থা। পরমহংস, শুকদেব আমায় মা মা বলিয়া সর্ব্বদা ডাকিতেন, যখন দেখা হইত তখনই মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সনক সনাতনাদি ঋষিগণ

ও ব্যাসদেব আমায় পুরান পাঠ করিয়া শুনাইয়াছেন। বৃহস্পতি একদিন চণ্ডী পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী সহিত দেখিয়াছি, তাঁহারা আমার কাছে জিজ্ঞাসু ভাবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির মহারাজের সঙ্গে আমার অনেক কথা হইয়াছে। কখনও বা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক সঙ্গে আসিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিয়া আমায় শুনাইয়াছেন, সেই অবধি আমি গীতা পাঠ বন্ধ করিয়াছি। ভগবান আমায় কুরুক্ষেত্র দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, সংসার এইরূপ যুদ্ধক্ষেত্র ধ্বংস করিয়া ফেল। দুর্য্যোধন মহাদুষ্ট মন, তাহা তোমার থাকিবে না। এই রূপ ভাবে ভগবান নানারূপ দর্শন করাইয়া মনে শান্তি দিয়া পরম ব্রহ্ম করিয়া ওঁবেষ্টিত যুগল চরণ বক্ষে স্থাপন করিয়া আমাকে স্তরে স্তরে উঠাইয়া নিয়াছেন।

(২৮)

স্বধামে গমনের পূর্ব্বে মা আহার করিতে পারিতেন না, বলিতেন, ক্ষুধা নাই। ঘোল ও আখের রস গ্রহণ করিতেন। নানা প্রকার ফল, দুধ, শর্ব্বৎ প্রভৃতি ভাল লাগিত না। মা বলিতেন, ঠাকুর চান না। ব্রহ্ম-অগ্নির তেজে ক্ষুধা নষ্ট হইয়াছে। ইক্ষুরস ভিন্ন সংসারে আর কোনই খাদ্য ভাল লাগে না, তাহাও একটী ভক্ত বালক বলিয়াছে বলিয়া। আমি তখন নিয়মিতভাবে মায়ের নিকট থাকিতাম যখন যাহা আদেশ করিতেন তাহাই

করিতাম। দয়া করিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, তুমি যে আমায় খাওয়াইবে আমি বেশ জানি।

এক বৎসর মা এইভাবে রহিলেন। নিজেই চলাফিরা করিতেন এবং সর্ব্বদা আত্মহারা হইয়া থাকিতেন। একদিন না খাইলে আমরা অস্থির হইয়া যাই, কিন্তু এতদিন অনাহারে থাকিয়া মায়ের ভাবান্তর হইল না। তিনি দিব্যভাবে সর্ব্বদা মধুর বাণী বলিতেন। তিনি বলিতেন, আমার কোন কষ্ট হয় না, সর্ব্বদা ব্রহ্মময়কে লইয়া থাকি।

গরম কালে মা নিজেই হাঁটিয়া উপরে যাইতেন, শশাঙ্ক (জনৈক শিষ্য) ধরিতে গেলে নিষেধ করিতেন। রাত্রে গরমে নিদ্রা আসিত না, পঞ্চানন (এক ভক্ত) হাওয়া করিত। শীতকালে দিনে মা ছাদের উপর বসিলে আমরা সযত্নে তাঁহার গায়ে তৈল মাখাইতাম। তিনি নানা মিষ্ট কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন, খাওয়া দাওয়া সারিয়া এখানে আসিবে ও ঠাকুরের সেবা করিবে।

কোন কষ্ট নাহি মোর মা কহিত বাণী,
সর্ব্বদা আনন্দে আছি ঠাকুর দেহ জানি।
পরমপদে স্থিতি মাতা সদা এই কথা,
দেহজ্ঞান নাহি মোর এভাব সর্ব্বদা।
এ দেহ তোমরা দেখ ক্ষীণ কায় বলি,
দুর্ব্বল না লাগে মোর ঠাকুর সকলি।
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ অঙ্গ হইতে লাগিল,
তাহাতে মায়ের আরো আনন্দ বাড়িল।

যখন যে ভক্তবৃন্দ আসিত নিকটে,
পুষ্প মাল্য দিয়া মায় পূজে অকপটে।
তুলিয়া সে ফুলরাশি আপনার করে,
আশীর্ব্বাদ দিত মাতা সকলের তরে।
বলিতেন এই দেহ জানি না কেমন,
তোমরা বল শুখায়েছে বুঝি না তেমন।
ভাল মন্দ বিচারের হাত নাহি মোর,
ঠাকুরের দেহ এটা জানি ভরপূর।
সেই হেতু নাহি জানি দুর্ব্বল কি সবল,
যাহা ইচ্ছা করিছেন গোবিন্দ মঙ্গল।
সাধন সমাপ্তি হতে রুচি নাহি আর,
অনাহারে থাকিতে বুঝি ভাল লাগে তাঁর।
অন্নত্যাগ যখন করিলেন জননী,
চারি পাঁচ দিন আগে কহিলেন তিনি।
ঠাকুরের অন্ন ভোগ আর না লাগিবে,
ভাল মন্দ বিচারিয়া পরে ত দেখিবে।
আহারে অনিচ্ছা মাত্র এই আমি দেখি,
ঠাকুরের দেহে রোগ কভু না নিরখি।
পরম ব্রহ্মের হয় খেলা, পরম ব্রহ্মের হয় লীলা,
সর্ব্ব অঙ্গে ব্রহ্ম অগ্নি ভরা।
আকাশ পাতাল জুড়ি, অগ্নি দেখি ছড়াছড়ি,
দেখতে পাই জ্যোতির্ম্ময় হরি।

রয়েছেন দেহ জুড়ি, স্নিগ্ধ মন্দ বাতাস করি,
সুশীতল করে মোর কায়।
স্বহস্তে যে পাখা ধরি বাতাস করেন হরি,
বলেন মোরে অতি ধীরে ধীরে।
সাধন সমাপ্তি হেতু ব্রহ্ম অগ্নি চতুর্দ্দিক,
তব অঙ্গে তাই শোভা পায়।
এক বৎসর অনাহারে রহিলে মা এ সংসারে,
দেহজ্ঞান নাহি যে তোমার।
আনন্দে চলিলে মাতা, তুমি যে পরম দেবতা,
তোমায় দেখিয়া যত নর।
বুঝিল না যত্ন করি শুন মা গো মহেশ্বরী,
সেবা যদি করিত ভক্তি ভরে।
পাইত অমূল্য ধন, নাহি সন্দেহ কখন,
পরা শান্তি ভুবন মাঝারে।
তুমি ভক্তিমতী সতী তুমি হও ভাগ্যবতী,
তুমি হও মহা পুণ্যকারী।
এক বৎসর অনাহারে কেবা যে আনন্দ করে,
দেখি নাই কখন ধরাতে।
দিব্যভাবে রহিলে তাই, দেখিতে পেলাম ধরায়,
ভক্তিমার্গ যতনে ধরিয়া।
পরম পদে স্থিত হইয়া আত্মহারা হয়ে গিয়া,
সোঽহম্ জ্ঞান না লইলে তুমি।

সদা বল এই বাণী, ঠাকুর যে আমি মানি,
সর্ব্বময় ঠাকুর বলিতে।
ধন্য তুমি জগৎ গুরু, ভক্ত তুমি কল্পতরু,
শান্তি দাতা আসিলে ভবেতে।
এরূপে ঠাকুর মোরে কহিলেন বাণী,
উজ্জ্বল দেখিনু শোভা দেব চক্রপাণি।
সর্ব্বদাই ঠাকুরের কাছে মোর মন,
বুঝিতে না পারি আমি আছি গো কেমন।
তোমরা যা বুঝ ভাল তাইতো করিবে,
ভালমন্দ জিজ্ঞাসা আমারে না করিবে।
সর্ব্বদা ঠাকুর কাছে আনন্দেই থাকি,
ভালমন্দ বিচারাদি কিছু নাহি দেখি।
সর্ব্বদাই সুখে আছি ঠাকুর লইয়া,
আনন্দে বিভোর চিত্ত ঠাকুর দেখিয়া।
তোমাদের সঙ্গে আমি কথা কই যখন,
বালিকা স্বভাব মোর হয় গো তখন।
কত কিছু কথা কই বুঝিতে না পারি,
সেই হেতু নানা কথা দিবস শর্ব্বরী।
পর পারের বন্ধু আছেন গুরুই কাণ্ডারী,
লইবে অচলা ভক্তি তাঁর পায়ে ধরি।
মন প্রাণ দিয়া নিজ ইষ্ট ভজ সদা,
এক লক্ষ্য নিয়া সবে থাকিবে সর্ব্বদা।

LIBRARY

মনটাকে জলের মত সদাই করিবে,
পর পারের বন্ধু বলি ভকতে সেবিবে।
বড় ভালবাসি আমি ভক্ত যদি হয়,
ভক্ত জনে ভালবাসলে ভবপারে যায়।
মনটাকে সর্ব্বক্ষণ করিবে যে নদী,
তবে ত পাইবে কৃপা তাঁর নিরবধি।
ভক্তি ভাব সদা যদি রাখিবে অন্তরে,
বাহিরে ভিতরে সদা দেখিবে ইষ্টেরে।
এক ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আছেন জগত-জুড়ি,
ইষ্ট ব্রহ্ম সার জানি তাঁহাকেই ধরি।
চারিদিকে করোনা দৌড়াদৌড়ি ভবে,
মায়া মোহ ত্যাগ করি ঠাকুর ভজিবে।
অজ্ঞানতা অহঙ্কার দূরে সরাইবে,
সুস্থ মনে একাসনে সাধন করিবে।
পুকুরেতে পানা কত ভাসয়ে সলিলে,
হাত দিয়া ঠেলি তাহা স্নান করে জলে।
সেইরূপে মায়ামোহ ঠেলিতে হইবে,
তবে পরপারের বন্ধু নিকটে পাইবে।
জ্ঞান-খড়্গ ধরি সদা অজ্ঞান আসিলে,
কাটিয়া যে দিবে তায় কহিনু কৌশলে।
দেহধারী জীবগণ সংসারী যে তায়,
সুখ দুঃখে আচ্ছাধিত থাকেত সদায়।

সেই হেতু বলি তোদের যদি ভাল চাও,
নির্ম্মল চরিত্র হইয়া হরিগুণ গাও।
ধীর স্থির হয়ে সবে সাধন করিবে,
অমূল্য রতন তবে দেখিতে পাইবে।
সাধন করিতে কিছু কঠিনতা নাই,
সর্ব্বদা যে ত্যাগ নিয়া থাকিবে সবাই।
সংসারে অনিচ্ছা সদা রাখিতে হইবে,
যতনেতে নিজের মন গঠিত করিবে।
গুরুজ্ঞান গুরুধ্যান গুরুকে চিনিবে,
আপন জানিয়া গুরু মন সমর্পিবে।*

(২৯)

ভগবানের পথ ছাড়া আর পথ নাই। সর্ব্বদা ভগবানকে নিয়া থাকিবে, তাঁকেই ডাকিবে। মায়ামোহ যত না আসে ততই ভাল। আকিঞ্চন ভাব থাকা চাই। আমি তোমাদের গুরু, আমার স্থূল দেহটা দেখিয়া তোমাদের কষ্ট হইতেছে, সেই জন্য কি চিন্তা? আমি কোন কষ্ট বোধ করি না, দেহত নশ্বর, চিরকাল থাকে না। গুরু কখনও মরে না, সর্ব্বদাই গুরু থাকে, গুরুত বাহিরের জিনিষ নয়? গুরু হইতেছেন ভিতরের জিনিষ। তবে যতক্ষণ গুরুর কায়া থাকে ততক্ষণ সেবা টেবা করিতে হয়, ভক্তিভাব নিয়া করিতে হয়। চাঞ্চল্যভাব লইয়া

* স্বধাম গমনের তিন দিন পূর্ব্বের উপদেশ।

গুরুর নিকটে আসিতে নাই। যদি বল, আমাদের চঞ্চল ভাব, কি করি? মনে বিচার করিয়া দেখ, যখন ঘরের কাজ কর তখনত মন প্রাণ দিয়েই কর। গুরুকে মানুষ মনে করিতে নেই। গুরুর সেবা ভগতৎ বুদ্ধিতে করিতে হয়। ঠাকুরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে হয়। সর্ব্বদা মনে ঠাকুরের ধ্যান ধারণা রাখিবে। আপন বলিতে সেই এক ভগবানই আছেন। দেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহা মনে সর্ব্বদা রাখিয়া ইষ্ট সাধনা করিবে। এ দেহটা হইতেছে মায়ার খাঁচা এবং নানা রকম রিপুর কারখানা। যাহাতে এই মায়ার খাঁচা হইতে ভগবানের নাম হয় মন-পাখীকে সেইরূপ গঠন করিবে মন-পাখীকে যা শিখাইবে সে তাই শিখিবে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই মন-পাখী বুলি ধরে। যখন ভগবৎইচ্ছা হয় তখন সর্ব্বদাই মনে হয় যে আমি ঠাকুরের নাম করি। সংসারের ইচ্ছা হইলে মনে নানা রকম ঝঞ্ঝাবাত আসে। সেইজন্য সর্ব্বদা ভগবৎ ইচ্ছাই ভাল। যতটা পারা যায় চেষ্টা করিতে হয়। মানুষ জন্ম সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি থাকে, কিন্তু সংসারে আসিয়া মানুষগুলি মায়ায় পড়িয়া একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া যায়।

নিজেরা আত্মশ্লাঘা বশে নিজের দোষ দেখে না। পরের দোষ কেবল অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়। ভক্তের কাছ দিয়া যাইতে চায় না, দূরে দূরে বেড়ায়। ভক্তের কাছে একটু যাওয়া আসা করিলে ভক্তিভাব আসে। সর্ব্বদা ঠাকুরকে নিয়াই থাকিতে হয়। ভক্তিভাব সকলের শ্রেষ্ঠ। ভক্তের সঙ্গে মিলা মিশা করিলে ভক্তি আসে। মনের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা দূর করিবার চেষ্টা কর, চেষ্টা করিতে

করিতে মন ঠিক হয়। চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজ নাই। ভগবৎ-বুদ্ধি নিয়া থাক। সর্ব্বদা ঠাকুরের কাছে ক্ষমা চাও। ক্ষমা চাইতে চাইতে একদিন দয়া হইবেই হইবে। মধুর ভাব হইতেছে ভক্তিভাব। নিজের অহঙ্কার সব ছাড়িয়া দাও, অহং থাকিলে পরে ভক্তি আসিতে পারে না। মানুষ হও, এমন যে দুর্ল্লভ মানব জন্ম হেলায় হারাইও না। সার বস্তু ধর, অসারগুলি ছাড়িবার চেষ্টা কর। হাতে কাজ কর, মুখে নাম কর। চোখ থাকতে ময়ুর পুচ্ছের মত অন্ধ হইয়া থাকিও না। ভগবানকে দেখিবার চেষ্টা কর। পর পারের কাণ্ডারী ভগবান ও ভক্ত। ভগবানকে ভাল বাসিলে ভক্তকেও ভাল বাসিতে হয়। ভগবান নিজেই বলিয়াছেন যে ভক্ত আমারই স্বরূপ। যে আমাকে চাহিবে সে ভক্তকেও চাহিবে। সব সময় একনিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। একলক্ষ্য, একমন হওয়া চাই। দুইমন হইলে পরে কিছুই হয় না। ভগবানের আশা নিয়া থাকিতে হয়। আশা নিয়া থাকিলে পর একদিন না একদিন আশা পূর্ণ হবেই। আশাপূর্ণকারী ভগবান। ভক্তি হইলে শক্তি আপনি দেখা দেয়। আদ্যাশক্তি ভগবতী, তাঁহার আরাধনা করিবে, তবেই শক্তিমানের সঙ্গে দেখা হইবে। জ্ঞান চাই, বৈরাগ্য চাই, প্রেম চাই, ভক্তি চাই। সর্ব্বদা মনে বিবেক নিবে। বিবেক না হইলে সংসার তুচ্ছ বোধ হয় না। কেহ যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়া ভগবানকে ডাকে তাহা হইলে তাহার আত্মীয় বন্ধুরা তাহাকে মায়ায় ফেলিবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানকে ডাকিতেছে তাহাকে

কিছুতেই মন টলাইতে পারে না। তখন তাহাদের মনে হয় আর তাহাকে বিরক্ত করিব না। দেখি আমাদের কি হয়। সংসারের ঝঞ্ঝাট নিয়া ত আছি, এইবার আমরা ওর মত একটু সাধন করি। ভক্তের বাতাস গায়ে লাগিলে ও মনের পরিবর্ত্তন হয়। সংসারে থাকিয়াও ভগবানের নাম ও ধ্যান করা উচিত। একদিন না একদিন যাইতেই হইবে এইটা সর্ব্বদা বিচার রাখা উচিত। যতই কাজ কর্ম্ম কর না কেন ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, তাহা হলেই সুবুদ্ধি আসিবে।

কুমারেরা পুতুল গড়ে কাঁচা মাটী দিয়া,
তেমনি ভাবে মন গড়িবে আকুল হইয়া।
কাঁচামাটী হয় যেমন যে দিকেতে নিবে,
বাঁকা সোজা হ'য়ে তথায় গঠন হইবে।
সত্যভাব নিলে পরে সত্যের সন্ধানে,
সর্ব্বদা যে সত্যব্রতী হয় নিজ মনে।
মিথ্যা ভাবে প্রবঞ্চনা আসে হৃদয় মাঝে,
মায়া মোহে ডুবে তারা থাকে বৃথা কাজে।
মনটি যে ভিজা মাটি কহি সার কথা,
সত্যের সন্ধানে মন রাখিবে সর্ব্বদা।
সত্য বিনা এসংসারে মিথ্যা সব হয়,
প্রবঞ্চনা করে যারা পাপী দুরাশয়।
সেই হেতু সত্যব্রত ধারণ করিবে,
সত্যের সন্ধানে সদা রত হয়ে রবে।

সত্য বস্তু নারায়ণ জগতের সার,
অসার বস্তুতে মন না রাখিও আর।
গোবিন্দেরে সার জানি তাঁহাকে ভজিবে,
হৃদয়ে চরণ পদ্ম স্থাপন করিবে।
আত্ম অহঙ্কার আর পর নিন্দা যত,
জন্মের মত ত্যাগ কর হইয়া নিশ্চিন্ত।
আপন ভাবিবে সদা প্রভু ভগবানে,
অন্য জন চিন্তা যেন না আনিও মনে।
গুরু ব্রহ্ম কর সার মনের মাঝারে,
ধৈর্য্য ধরি সাধন ভজন করিও তাঁহারে।
আকুল ব্যাকুল হয়ে থাক ইষ্ট তরে,
ইষ্ট বিনা গতি নাই সংসার মাঝারে।
পরম গুরু হন তিনি প্রভু নারায়ণ,
গুরু ব্রহ্ম জানি তত্ত্ব করিবে সাধন।
সাক্ষাৎ হইয়া গুরু দেখা দেন তারে,
যদি কেহ আকিঞ্চনে গুরু চরণ ধরে।
ব্রহ্মরূপে দর্শন দেন গুরু মহাজন,
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহাধন।
গুরুজ্ঞান, গুরুধ্যান, গুরুই ভাবনা,
সর্ব্ব সময় গুরুরূপ কর উপাসনা।

এমনি করিয়া মা আমাদের সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। আমরা মায়ের অকৃতি সন্তান। মায়ের এমন মধুর ভাব আমরা উপলব্ধি

কিছুতেই মন টলাইতে পারে না। তখন তাহাদের মনে হয় আর তাহাকে বিরক্ত করিব না। দেখি আমাদের কি হয়। সংসারের ঝঞ্ঝাট নিয়া ত আছি, এইবার আমরা ওর মত একটু সাধন করি। ভক্তের বাতাস গায়ে লাগিলে ও মনের পরিবর্ত্তন হয়। সংসারে থাকিয়াও ভগবানের নাম ও ধ্যান করা উচিত। একদিন না একদিন যাইতেই হইবে এইটা সর্ব্বদা বিচার রাখা উচিত। যতই কাজ কর্ম্ম কর না কেন ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিও, তাহা হলেই সুবুদ্ধি আসিবে।

কুমারেরা পুতুল গড়ে কাঁচা মাটী দিয়া,
তেমনি ভাবে মন গড়িবে আকুল হইয়া।
কাঁচামাটী হয় যেমন যে দিকেতে নিবে,
বাঁকা সোজা হ'য়ে তথায় গঠন হইবে।
সত্যভাব নিলে পরে সত্যের সন্ধানে,
সর্ব্বদা যে সত্যব্রতী হয় নিজ মনে।
মিথ্যা ভাবে প্রবঞ্চনা আসে হৃদয় মাঝে,
মায়া মোহে ডুবে তারা থাকে বৃথা কাজে।
মনটি যে ভিজা মাটি কহি সার কথা,
সত্যের সন্ধানে মন রাখিবে সর্ব্বদা।
সত্য বিনা এসংসারে মিথ্যা সব হয়,
প্রবঞ্চনা করে যারা পাপী দুরাশয়।
সেই হেতু সত্যব্রত ধারণ করিবে,
সত্যের সন্ধানে সদা রত হয়ে রবে।

সত্য বস্তু নারায়ণ জগতের সার,
অসার বস্তুতে মন না রাখিও আর।
গোবিন্দেরে সার জানি তাঁহাকে ভজিবে,
হৃদয়ে চরণ পদ্ম স্থাপন করিবে।
আত্ম অহঙ্কার আর পর নিন্দা যত,
জন্মের মত ত্যাগ কর হইয়া নিশ্চিন্ত।
আপন ভাবিবে সদা প্রভু ভগবানে,
অন্য জন চিন্তা যেন না আনিও মনে।
গুরু ব্রহ্ম কর সার মনের মাঝারে,
ধৈর্য্য ধরি সাধন ভজন করিও তাঁহারে।
আকুল ব্যাকুল হয়ে থাক ইষ্ট তরে,
ইষ্ট বিনা গতি নাই সংসার মাঝারে।
পরম গুরু হন তিনি প্রভু নারায়ণ,
গুরু ব্রহ্ম জানি তত্ত্ব করিবে সাধন।
সাক্ষাৎ হইয়া গুরু দেখা দেন তারে,
যদি কেহ আকিঞ্চনে গুরু চরণ ধরে।
ব্রহ্মরূপে দর্শন দেন গুরু মহাজন,
গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরু মহাধন।
গুরুজ্ঞান, গুরুধ্যান, গুরুই ভাবনা,
সর্ব্ব সময় গুরুরূপ কর উপাসনা।

এমনি করিয়া মা আমাদের সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। আমরা মায়ের অকৃতি সন্তান। মায়ের এমন মধুর ভাব আমরা উপলব্ধি

করিতে পারি নাই। মা এক বৎসর পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন। তাঁহার আর কোন ব্যাধি আমরা দেখিতে পাইতাম না, কেবল তাঁহার আহার বন্ধ ছিল। কোন কোন সময় সামান্য বেদানার রস আহার করিতেন, কি ছটাক খানেক দুধ। তবে স্বধাম গমনের মাস তিন চার আগে তাহাও বন্ধ হইয়া গেল, কেবল সামান্য ইক্ষুরস খাইতেন, বলিতেন যে এটাই আমার ভাল লাগে। আমরা যদি জোর করিয়া দুগ্ধ, বেদনা অথবা কমলা লেবুর রস খাইতে দিতাম, তাহা হইলে বমি হইয়া যাইত। যখন মা বমি করিতেন, তখন আমাদের ভয় হইত, মা বোধ হয় আমাদের উপর খুব বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তখনি দেখিতে পাইতাম মা হাসিতেছেন। হাসিয়া বলিতেন, "তোমরা ত কিছু বুঝ না, ঠাকুরের যে ওসব খাওয়ার আর ইচ্ছা নাই। আমি কি করিব? জোর করিয়া কি কিছু ঠাকুরকে খাওয়ান যায়? তবে তোমাদের মনে হয় যে মায়ের শরীরটা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, মাকে খাওয়াই। এ শরীরটা যে ব্রহ্মের সঙ্গে একেবারে লয়। সেইজন্য এখানকার জিনিষ কিছু খাইতে পারে না। আমি ত শরীরে কোন দুর্ব্বলতা বোধ করিনা।" মা আমাদের সঙ্গে কত কথা কহিতেন ও কত উপদেশ দিতেন। এত যে দুর্ব্বল ছিলেন তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতাম না। সর্ব্বদাই মধুর ভাবে থাকিতেন, ভরপূর আনন্দ নিয়া। আমরা একদিন না খাইলে অস্থির হইয়া যাই, আমাদের মা জগজ্জননীর এক বৎসর অনাহার, তাহাতে মধ্যে মধ্যে বমি হইত। তাহাতেও তাঁর কোন

রকম রাগ বা রুক্ষ স্বভাব দেখা যায় নাই, বরং আগের চেয়ে মায়ের মধুর ভাব, মিষ্ট কথা। কত স্নেহে যে আমাদের ডাকিতেন এবং কথা বলিতেন তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ মা আমাদের ছাড়িয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন। আমি অভাগিনী, মায়ের কৃপায় অনেক কিছু পাইয়াও মায়ের স্থূল দেহ বেশীদিন সেবা করিতে পারিলাম না। আমার মন মধ্যে মধ্যে খুবই অস্থির হইত মা আমাকে প্রবোধ দিতেন, বলিতেন গুরু কখন মরে না, তুমি সর্ব্বদা আমায় দেখিতে পাইবে। দেখ, তুমি ত আমার ভিতরের সব দেখিতে পাইতেছ। একদিন আমি দেখিতে পাইলাম যে মায়ের ভিতর পাঁচটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। মাকে বলিলাম, "মা, আমি যে এই পাঁচটী কুণ্ড দেখিতেছি এটা কি সত্য?" মা বলিলেন, "হ্যাঁ তা ঠিকই দেখিয়াছ। ব্রহ্মকুণ্ড বলিয়া আমার কাছে বাণী হইয়াছিল।" মা আমাকে বলিতেন যে তরু, তুমি ত সমস্তই দেখিতে পাও, আমাকে আর জিজ্ঞাসা কি কর? ভিতরের খেলা ত কেহ বুঝে না, নানা জনে নানারকম কথা কয়। মা যে এতদিন পর্য্যন্ত এত দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছিলেন তাহাতে ও মায়ের কোন কষ্ট ছিল না। সর্ব্বদাই শান্তমূর্ত্তি ও মিষ্টভাষা; আর সকলকে উপদেশ। মায়ের যখন স্বধামে গমন হয় তখন মায়ের স্থূল অঙ্গে হৃদয়ে একটি সাধক ভক্ত দেখিতে পাইল নীল আকাশ, তাহার মধ্যে রাধাকৃষ্ণ জ্যোতির্ম্ময়, সাদা মিশ্রিত নীল জ্যোতি। সে সাধক ভাবাবেশেই ছিল। আর আমি দেখিতে পাইয়াছি

বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা মাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন এবং চারিদিকে বেদধ্বনি হইতেছে। নারায়ণ চতুর্ভুজরূপে চক্র ধরিয়া মায়ের মস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন। মস্তক হইতে একটী শ্বেতবর্ণ জ্যোতি বাহির হইয়া নারায়ণের অঙ্গে মিশিয়া গেল এবং স্থূল দেহে কপাল ভরা ওঁকার। যুগল ওষ্ঠকে বেষ্টন করিয়া একটি ওঁকার বিস্তারভাবে রহিয়াছে। যাহারা মায়ের ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাহারা সকলেই দেখিয়াছেন। সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মায়ের স্বধাম গমনের দু তিন ঘণ্টা আগে মায়ের দুখানি চরণ কমল হইতে এমনভাবে লাল জ্যোতি বাহির হইল যে মনে হইল যেন লাল অগ্নি বাহির হইতেছে, তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। মায়ের স্বধামে যাওয়ার আগে মায়ের মুখচন্দ্র অতিশয় শোভা পাইয়াছিল। যাহারা না দেখিয়াছে তাহাদের বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। আমাদের যে এমন পরম মহাপুরুষ গুরু ছিলেন তাহা এতদিন বুঝিয়াও বুঝিতে পারি নাই।

স্বধামে গমন কালে মায়ের দুটি চক্ষু যোগীদের চক্ষুর মতই ছিল, অল্পখোলা, অর্দ্ধোন্মীলিত। হাত দুখানি মা বুকের উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন। মা ভাল অবস্থায়ও যখন শুইতেন তখন মায়ের হাত সর্ব্বদাই বুকের উপর ধ্যান মুদ্রায় থাকিত। স্বধামে যাওয়ার সময়ও তাই ছিল। মা সহজ অবস্থায় যখন শুইতেন, কি বসিতেন মায়ের হাত দুখানি ধ্যান মুদ্রা ছাড়া থাকিত না।

মা কখনও নিজের খাওয়ার কথা নিজে বলিতেন না। ঠাকুরের খাওয়া, কি ঠাকুরের কাপড় ঠাকুরের বিছানা, ঠাকুরের ঘর ইহাই

বলিতেন। ঠাকুর ব্যতীত মায়ের কোন কথাই ছিল না। একমাত্র নিজের মাতা পিতা বলিয়া পরিচয় দিতেন, আর তাঁহার ভাইদের বলিতেন, মায়ের ছোট ছেলে, মায়ের বড় ছেলে। আর বলিতেন মায়ের দেশ এইটা, বাপের দেশ ঐটা। আমার বলে কোন কথা ব্যবহারিক জগতেও ব্যবহার করিতেন না। আমরা যখন জিজ্ঞাসা করিতাম, "মা আপনার কয়টি ভাই বোন?" মা বলিতেন, "আমার ভাই ভগিনী কি? তবে আমার মায়ের পাঁচটি সন্তান। এখন এসব কথায় আর কি আছে? আমার সবই ঠাকুর।" আমাকেও মা শিখাইয়া দিয়াছিলেন, "কাহারও কাছে আর পরিচয় দিও না, সংসারের মধ্যে এক মাতা পিতার পরিচয় দেওয়া চলে। ঠাকুর নিয়া থাকিতে হইলে এইসব ছাই ভস্ম ছাড়িয়া দিতে হয়। সর্ব্বদা ঠাকুর বলিয়া কথা বলিবে, এই তোমাকে বলিলাম। মিথ্যা কথা কখন বলিও না, তাহাতে যা হয় হইবে। ঠাকুরের কৃপায় সুন্দর কত কি দেখিতে পাইতেছ, তাহা নিয়া থাকিবে, আর তোমাকে যে সন্তান দিয়াছি এ হইতেছে সাধু ও ভক্ত। ইহাকে যেন ছাড়িয়া দিও না; এ আমার আদেশ রহিল।" আমি মাকে বলিলাম, "মা আমার যে মায়া হয়, আপনি ত মায়া ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে আমার বন্ধন হইবে না?" মা বলিলেন, "ভক্তের মায়াতে বন্ধন হয় না। ভগবৎ বুদ্ধি নিয়া মায়া করিবে। নিজের স্বার্থ সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে।" মা আমায় বলিতেন, "সর্ব্বদা শান্তি নিয়া থাকিও।" আমি মাকে একদিন বলিলাম যে মা, এখন ত গেলেই হয়। মা বলিলেন, "তরু, তুমি একেবারে মূর্খ, মনের

মধ্যে এভাব রাখিবে যে ঠাকুরের যখন যে ইচ্ছা হইবে তাহাই হইবে। তুমি কেন পূর্ব্ব হইতে এইটা মনে আন। ঠাকুর পাইয়াছ, এখন ঠাকুর নিয়া কিছুদিন থাক।" মায়ের যে এমন মহাকৃপা ইহা আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। মায়ের কৃপায় সমস্ত উপলব্ধি করিয়া সব বুঝিতে পারিলাম। মায়ের কৃপায় আমি খুবই শান্তি পাইয়াছি। মা যে আমার পরম ব্রহ্ম তাহা আমি দেখিয়াছি। শান্তির ঘরে মা আমাকে বসাইয়া দিয়া স্থূলদেহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। এত দেখিয়াও মায়ের কথা মনে হইলে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তবে সে ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকে না। আমি সর্ব্বদাই তাঁকে বুকে দেখিতে পাই, নিশি জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, প্রত্যেক অবস্থায়।

দুলিয়া দুলিয়া, হৃদয়ে আসিয়া,
কথা যে কহেন ধীরে।
(সেই) মধুর সংভাষা পুরান যে আশা,
দেখি নিজ অন্তঃপুরে।
(দেখি) আপন করেতে লয়ে পুষ্প তাতে,
আশীর্ব্বাদ দেন শিরে।
(আমি) মালাটি গাঁথিয়া যতন করিয়া,
চরণ ছোঁয়াই তাঁর।
(শেষে) মালা গলে দিয়া প্রণাম করিয়া,
স্তুতি করি অম্বিকার।

(বলি) সিদ্ধিমাতা তুমি গুরু নারায়ণী,
ভক্তি খাটি তব কাছে।
হই মূঢ় মতি শুন মাগো সতী,
রাগ মাতা মোর আছে।
মা বলেন ধীরে রাখ ক্ষমা ঘরে,
যাইবে যে রাগ চলি।
(শেষে) মধুর মুরতি দেখি সে শ্রীপতি,
মায়ের অঙ্গেতে মিলি।
(বসে) নারায়ণী তায় মা যে তথায়,
নারায়ণ রূপ হয়।
(মা) চতুর্ভুজধরি পদ্মের উপরি,
ওঁকার আছে তথায়।
(মা) ওঁকার বেষ্টিত দেখি জ্যোতি কত,
পূর্ণ ব্রহ্ম পরম পদে।
শ্বেতময় জ্যোতি সুন্দর মুরতি,
মা যে রয়েছেন তাতে।
(বলে) আশীষ বচনে থাক ইষ্ট সনে,
দিব আমি তোদের বর।
বৃন্দাবনে আসি জীবনী প্রকাশি,
যাও তুমি নিজ ঘর।
শান্তিভাবে রবে সম্মান না চাবে,
অপমান নাহি লবে।
গণ্য মান্য ধনে রাখিবে না মনে,
সমতা লইবে ভবে।

[৩০]

সাধনার বিকাশ হইলে ভিতরে জ্ঞান স্থায়ী হয়। সাধক আপনাকে বুঝিতে পারে। তত্ত্বজ্ঞান আপনা হইতেই ফুটিতে থাকে। সাধকের ক্রমান্বয়ে ভাব পরিবর্ত্তন হয়। প্রথম অবস্থায় কর্ম্মযোগ নিয়া সেবা কর্ম্ম করিতে হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় উদাসীন ভাব আসে। তৃতীয় অবস্থায় দেহ, মন গঠন হয়। সর্ব্বদা ভগবৎ কথায় প্রীতি থাকে। মনের চাঞ্চল্য ভাব দূরে যাইতে থাকে। চতুর্থ অবস্থায় নির্লিপ্ত ভাব আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাহা আত্মদর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থির থাকে না। জলের ঢেউয়ের মতন আসা যাওয়া করে। ভিতরের জ্ঞান ফুটিলে বাহিরে জিনিষগুলি আর ভাল লাগে না। তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা তত্ত্ব কথায় সংযত চিত্তে সমন্বয় করিয়া ফেলে। আত্মহারা হইয়া ভাবরাজ্যে চলিতে থাকে। "আমি, আমার" এইভাব ইষ্টের সঙ্গে মিলাইয়া লয়। যতদিন পর্য্যন্ত মন লয় না পায় ততদিন মনের চাঞ্চল্য থাকে। জ্ঞান নিয়া কর্ম্ম করা ভাল। আমার কর্ম্ম বলিয়া কিছু রাখিতে নাই। ভগবৎ বুদ্ধি নিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হয়। নিঃস্বার্থভাবে সেবাকর্ম্ম করিবে। ঠাকুরের কাছে নিজের সুখের জন্য প্রার্থনা করিতে নাই এবং সাধনও কোন সুখ আশা নিয়া করা ভাল নয়। যাহাতে ভগবান সুখী হন মনপ্রাণ দিয়া তাহার চেষ্টা রাখিতে হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টি জিনিষ ত্যাগ করিতে পারিলেই ভগবান সুখী হন। তাহার চেষ্টা রাখিতে হইবে। চেষ্টা কতদিন, যতদিন বাহিরের জ্ঞান থাকিবে। যতদিন আত্মশুদ্ধি না

হইবে, ততদিনই চেষ্টা রাখিতে হইবে। আত্মশুদ্ধি হইলে নিজে নিজেই সমস্ত কর্ম্মগুলি ছাড়িয়া যায়। কর্ম্ম ছাড়িয়া গেলে নির্লিপ্ত অবস্থা আসে। ভগবৎচরণে মনের লয় প্রাপ্তি হয়। ভিতর বাহির এক হইয়া যায়। দ্বিধা ভাব থাকে না। সর্ব্বসময় ভগবানকে দেখা যায়। পশু, পাখী, মানুষ, স্থাবর ও জঙ্গম সকলের মধ্যেই ভগবানের রূপ দৃষ্ট হয়। দ্রষ্টব্য পথে চলিতে পারা যায়। সংসারে অনির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। জগতে আমি আমার বলিয়া যে কেহ আছে তাহা মনে হয় না। তুমি ও তোমার সকল জীব, তুমি মহাশিব দেখা যায়। আমি আমার ভাব কতদিন থাকে? যতদিন মায়া। মায়ার বন্ধন ছিন্ন হইলে আমিত্বভাব ঘুচিয়া যায়। জীবাত্মার জ্ঞান মায়া। জীবাত্মা যখন শিব হইয়া যায় তখন তার সংসারে মায়া ভুল হইয়া যায়। পরমাত্মার দেখা পাইয়া জীবাত্মা তাহার কাছে কাঁদিতে থাকে। তিনি তখন জীবাত্মাকে জ্ঞান উপদেশ দিতে থাকেন। শুদ্ধজ্ঞান না হইলে ভক্তিও স্থায়ী থাকে না। শুদ্ধজ্ঞানে ভক্তি স্থায়ী হইয়া যায়। অজানা ও অচেনা বস্তুর প্রতি চেষ্টা করাই বৃথা। সেইজন্য সাধকের জানিবার ও চিনিবার জন্য সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধান করা উচিত। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কোন প্রকারেই ভিতরে প্রবেশ করা যায় না তত্ত্বজ্ঞানে শান্তি আসিয়া পড়ে। শান্তি না হইলে সাধন কি করিয়া করিবে? অশান্ত চিত্তে অনেক রকম চিত্তবৃত্তি আসে। সেগুলি লয় করিবার জন্য শুদ্ধজ্ঞান সঞ্চয় করিবার চেষ্টা সর্ব্বদা রাখিতে হইবে। পরমাত্মা ভগবান ভিতরে সর্ব্বদাই আছেন। বাহিরের কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া

ভিতরের কর্ম্মী হওয়া সাধকের বিশেষ দরকার। বিবেক বৈরাগ্য না ধরিলে ভিতর কর্ম্ম করিবার চেষ্টা রাখা যায় না। কীর্ত্তিমান পুরুষেরা ভগবানের কীর্ত্তির জন্য আপনাকে গঠন করিয়া লয়। অকৃত্রিমভাবে তপস্যা করে। কৃত্রিমভাবে ভগবৎপদ লাভ হয় না। আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় যত বাড়াও ততই হয়। তাহার আর শেষ নাই। তাহার শেষ কিসে হয়, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সর্ব্ব বিষয়ে অরুচি হইলে। জীবকে সর্ব্বদা শিবজ্ঞান লইতে হইবে। জ্ঞান হইলে সব খণ্ডন হয়। অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন তামসিক ব্যাপার এই জগতে অনিত্যের চেষ্টা। সে চেষ্টা কোন দিনই কেহ পূর্ণ করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। মানুষে যতই চেষ্টা করুক না কেন কখনই সম্পূর্ণ কামনা পূর্ণ হইবে না। মোহের অন্ধকারে মায়ার বশে সকলের কাছে ঠেকিতে হইবে। এক পূর্ণচন্দ্র ভগবান। তাঁহাকে ধরিলে সকল কামনাই পূর্ণ হইতে পারে। জীব যাহা চাহে তিনি সবই পূর্ণ করিয়া দেন, কিছুই অপূর্ণ থাকে না। মধুর ভাব, মধুর প্রেম ভগবান ছাড়া কাহারও কাছে হয় না। তুমি যাহাকেই ভালবাস না কেন সে কিন্তু তোমাকে মধুরভাবে ভালবাসিবে না। তুমি যাহাকে প্রাণের সমান ভালবাস সে তোমার কোন দোষ পাইলে তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতেও ছাড়িবে না। ফাঁসিকাষ্ঠ হইতেছে মোহ। যতই ভালবাসিবে ততই আটকাইয়া যাইবে কিন্তু ভগবান সদ্‌গুরু ঈশ্বর। তাঁহাকে ভালবাসিলে সর্ব্বদা অমৃত পান করিতে পারিবে। মধুসূদনকে মধুরভাব নিয়া ভালবাসা চাই। দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবও

ভাল। সকলের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। জ্ঞান না হইলে কোন ভাবই স্থায়ী থাকে না। বেদান্ত ভাব নিয়া চিত্তবৃত্তি শান্ত করা যায়। ভক্তি-ভাবে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। আত্মসমর্পণের জন্য মনের গঠন করিতে হইবে। যাহারা আত্মসর্পণ করিয়াছেন তাহাদের কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকে না। এমন কি ভগবানকে পাইব এই আশাও মনে ওঠে না। একেবারে নির্লিপ্ত ও নিরীহ অবস্থা। আর কিছু চাহিবার শক্তি থাকে না। একেবারে লয়, মনে কোন ভাবই ওঠে না। সে যে ভগবানের হইয়া যায়। চাহিবার শক্তি কোথায়? কে চাহিবে? সে ভক্ত ত "আমি, আমার" জানে না। প্রাণ, মন সঁপিয়া দিয়াছে, কি করিয়া জানিবে? পরমাত্মা ভগবান ইচ্ছা করিয়া যাহা করান আত্মসমর্পণ-ব্যক্তি তাই করিতে থাকে। তার আর কোন দিকে লক্ষ্য যায় না। একলক্ষ্য ভগবৎ চরণে থাকে। সংসারে মাটির পুতুল নিয়া খেলাধূলা কি করিয়া করিবে? সে যে চিন্ময় হইয়া গিয়াছে। মাটির সঙ্গে আর মিশিতে পারে না। সর্ব্বদা সংসারটা মাটির পুতুল দেখিতে থাকে। মাটির বাসন, মাটির আসন, মাটিরই ঘর বাড়ী। আত্মতত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সর্ব্বদা অনাসক্ত। তাহাদের কিছুতেই আসক্তি নাই। পরমপিতার আরাধনাতে মন মজাইয়া দিয়াছে। আর অনিত্য বস্তুতে মজিতে চায় না। অহংজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া সোহংজ্ঞান ধরিয়াছে। জগতে মন ও প্রাণ কিছুই নাই। পরমাত্মা গোবিন্দের সঙ্গে তাহার প্রাণ মিশিয়া গিয়াছে। নয়নে কোন রূপই আর ভাল লাগে না। চরণে ভগবানের জায়গা ছাড়া চলিতে আর ইচ্ছা করে না। হৃদয়-

মন্দিরে নিজের ইষ্ট প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত সেই ইষ্টের সঙ্গে কথা কহিতে, হাসিতে, কাঁদিতে ভালবাসে। জগতের কাছে সে মরার মতন হইয়া যায়। শব কি কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে যায়, না হাসিতে যায়? গোবিন্দের ভক্তের সেই অবস্থা। জগতে মরা না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠা হয় নাই জানিবে। এইগুলি বিচারের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা দেখিয়া লইতে হইবে যে আমি দোষী কি নির্দোষ, জ্ঞানী কি অজ্ঞান। কথার ছলে মানুষকে ভুলাইলে হইবে না। তাহাতে নিজেরই ক্ষতি। জগতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি দেখা যায় না। কারণ তাহারা কেহ ভগবানের পথে চলিবার চেষ্টা করে না। যদি কেহ চেষ্টা করেন তবে তিনি সেই সমস্ত কথা শুনিয়া নিজকে গঠন করিয়া নেন। সাধুর কাছে আসিয়া সে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি প্রবঞ্চিত হয় না। ভক্ত সাধুর বাক্য শুনিয়া সে সব কথা ভক্ত ব্যক্তির মনে গাঁথা হইয়া যায়। সেইজন্য মনকে খাঁটি ও সাধু করিয়া ফেলা দরকার। লোককে প্রবঞ্চনা করিলে নিজেই প্রবঞ্চিত হইতে হইবে। খাঁটি সোনা না হইলে কিছুদিন ব্যবহার করিলেই পিতলের মত দেখা যায়। খাটি সোনার রং বদলায় না। নিজের মনকে নিজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা কর। তাহা না হইলে তোমাকে মন ফাঁকি দিয়া কুপথে নিয়ে যাবে। মায়ায় পড়িয়া সাধক কখনও ভুলিবে না। অজ্ঞানই হইতেছে মায়া, শুদ্ধজ্ঞান হইতেছে মুক্তি। মুক্ত পুরুষ কখনও কামিনী ও কাঞ্চনে আসক্ত হইবে না। এই দুটি বস্তুর উপর সর্ব্বদা উদাসীন থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে পর-

পারে কখনই যাইতে পারিবে না। পরপারের বন্ধু ভগবান। ভক্তি ছাড়া নাম করিলে কার্য্য সফল হয় না। মনটাকে সর্ব্বদা সংসার হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। ঠাকুরের তন্ত্রে তন্ত্রী হও। তন্ত্রসার ভগবান। তাঁহার সঙ্গে একতন্ত্রী হইয়া মিশিতে হইবে। পরতন্ত্র হইলে ইষ্টসিদ্ধি লাভ হইবে না। ইষ্ট দেবতাই আমার, আমিও তার। জগতে মিথ্যাভাষা কহিয়া নিজে মিথ্যায় পড়িয়া যাইও না। সর্ব্বদা সত্যপথে চলিতে থাক। বিবেক বৈরাগ্য আপনি সঙ্গে আসিবে। সত্য বস্তুর এমনি গুণ যে, আর মিথ্যা বলিতে ও মিথ্যাচরণ করিতে পারা যায় না। যদি কোন প্রকারে মিথ্যা বস্তু ভক্তের নিকটে আসে তবে তাহার প্রাণে বজ্রের সমান আঘাত হয়, সহ্য করিতে পারে না। যতদিন সে অবস্থা না হইবে ততদিন জানিবে যে, এখনও ভিতরে লুক্কায়িত ভাবে মিথ্যা কামনা রহিয়া গিয়াছে। মিথ্যা কামনাগুলি শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। নিজেকে নিজে জাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। না জাগিলে মিথ্যা স্বপ্ন যায় না। নিদ্রিত ব্যক্তি স্বপ্নটাকে নিদ্রিত অবস্থায় সত্য বলিয়াই মনে করে। যখনই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় তখন দেখে, স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছে সবই মিথ্যা। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলনে যেমন সুখ হয়, তেমনি অবিচ্ছিন্ন সুখ ইষ্টের মিলনে হইয়া থাকে। সে সুখ কোন কালেও লয় হয় না। শুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই সুখ অনুভব করিতে থাকে। রতি প্রীতি সর্ব্বদা জন্মিতে থাকে। তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ করিতে আর ইচ্ছা হয় না। পুরুষ-প্রকৃতির সুখ ক্ষণস্থায়ী, অতি জঘন্য ও ঘৃণার্হ জিনিষ। সামান্য সুখের আশায় জীবগুলি

অনবরত নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে। পরমাত্মার তাহাতে তৃপ্তি নাই। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, নির্লিপ্ত। পাপ পুণ্যের ভাগী তিনি নন। মানুষ প্রারব্ধবশে সকল কার্য্য করিতেছে হুঁস ছাড়িয়া। কেহ কেহ বলে, প্রারব্ধ কি আমার কৃত? ঐ কথাটি-ও মিথ্যা। প্রারব্ধ ইচ্ছাকৃত ফল, তাহা ভোগ করিতেই হইবে। না ভোগ করিয়া যাইবে কোথায়? যাহাদের জ্ঞান নাই, বিবেক নাই, বৈরাগ্য নাই তাহারা কি করিয়া প্রারব্ধ খণ্ডাইবে? যদি তাহা ছাড়িতে চাও তবে ঐ তিনটি বস্তুর সঙ্গে মিত্রতা কর। তবেই প্রারব্ধ কাটিবে। আত্ম-অহঙ্কার তত্ত্ব ছাড়িয়া সার তত্ত্বের সন্ধান কর। প্রেমে সর্ব্বদা মাতিয়া থাক, ভগবানের প্রেম। ঠাকুর ছাড়া কেহ তোমাদের শান্তি দিতে পারিবে না। বিষয়-বুদ্ধি ত্যাগ না করিলে বিষের জ্বালা যাইবে না। বিষয়ী ব্যক্তি যতই বিষয় পায় ততই তার আশা বাড়িতে থাকে। তাহা কখনও পূর্ণ হয় না। এই জগতের যেমন বিষয়ের আশা পূর্ণ হয় না, ভক্তের চিত্তে তেমনি ভগবৎ বিষয়ের আশা, পিপাসা, লালসা ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে। ভগবৎ বিরহ-ব্যথা সে বিষয় পাইলে তবেই যায়, তৃষ্ণার নিবৃত্তি ও প্রাণের তৃপ্তি হয়। দেহটি ভাঙ্গা খাঁচা। প্রাণ পাখী সেই খাঁচাতে বাস করে, কখন ভাঙ্গা ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে ঠিক নাই। তাহা স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করা উচিত। তাহা হইলে কোন রকম আসক্তি আসিতে পারে না। অন্তর-দৃষ্টি খুলিলে তবেই অনাসক্তভাবে সকল ছাড়িয়া চিত্তবৃত্তিগুলি লয় পাইতে থাকে। ভাবেতে ভাবুকের রাজ্যে পৌঁছিতে পারে।

ভাবের ঠাকুর ভগবান তাহাকে নিজের দেশে পৌঁছাইয়া দেন। সাধকের সাধনা সমাপ্তি করিবার ক্ষমতা দয়াল ঠাকুর ছাড়া কাহারও নাই। তবে সকল ইচ্ছাকে লয় পাওয়াইতে হইবে। ইচ্ছাশক্তি যতদিন থাকিবে ততদিন নিজেরও শান্তি নাই, আমার গোবিন্দের-ও শান্তি নাই। গোবিন্দ ইচ্ছা থাকিতে ধরিয়া নেন না। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে থাকেন। তিনি যে পরীক্ষক, পরীক্ষা করিয়া লন। কতদূর কাহার দৌড় আছে তাহা দেখেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে ডাকে তাহাকে তিনি মায়া মোহের কূপে ফেলিতে চাহেন না, জ্ঞানের আলো ক্রমান্বয়ে ফুটাইতে থাকেন। ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিলে আর কোন ভাবনাই থাকে না, সংসারের ভাবের অভাব হইয়া যায়। ভাবুক ব্যক্তি নিজের দেশে গিয়া আত্মীয় বন্ধু নিয়া শান্তিতে থাকে, পরমাত্মার পরমধামই তার স্বদেশ। পরের দেশ অসার সংসার, পর দেশে বড়ই কষ্ট। সকলকেই পরিচয় দিতে হয়। তাদের সঙ্গে নানা রকম কথাবার্ত্তা বলিয়া তবে আপন হইতে হয়। কিন্তু নিজের দেশে গেলে আর কোন পরিচয় দেওয়ার দরকার হয় না। নানারূপ হাবভাবেরও প্রয়োজন হয় না। আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে আপনা আপনি ভাব হইয়া যায়। সেখানে কোন কঠিন ব্যাপার নাই। সুন্দর ও অতি সরল, ছল চাতুরী থাকে না। পরের সঙ্গেই ছল চাতুরী করা হয়, আত্মীয়কে ঠকাইবার চেষ্টা কাহারও নাই। জীবগুলি মায়ায় পড়িয়া মিথ্যা নিয়া আপনাকে আপনি অপব্যয় করিতেছে। উর্দ্ধ মন যদি করিতে চাও, যদি আপনাকে বাচাইতে চাও তবে সর্ব্বদার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রত

ধারণ কর। তবেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হইবে। তবেই আত্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ব্রহ্মানল হইতেছে শুদ্ধজ্ঞান, সেই শুদ্ধজ্ঞানে সকল স্পৃহা দগ্ধ হইয়া যায়। ব্রহ্মে স্থিতি হইলে অনিত্য বস্তুর কথা আর মনে পড়ে না এবং কোন দিন যে অনিত্য বস্তু নিয়া খেলা করিয়াছি তাহাও আর স্মরণ থাকে না।

সর্ব্বদা চিন্ময় পরম জ্যোতিঃ ভরা দেহ দেখা যায়। আর অশান্তি আসিতে পারে না। সুস্থ ও সবল, রোগ ও ব্যাধি কিছুই নাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক হইয়া যায়। পরম প্রকৃতি ভগবতী অপরা প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া দেন। অতি সুন্দর, সিগ্ধ ও সুশীতল চিত্ত সর্ব্বদাই থাকে। শীতোষ্ণ বোধ থাকে না। কে কার ধ্যান করিবে তাহাও জানে না। পরমপদে স্থির হইলে একেবারে সর্ব্ব-দিকে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্ম্মল ও শুভ্র জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত "আমি ও তুমি" এই ভাব অন্তরে রাখিয়া তাহাও স্থির রাখিতে পারে না। সকলই ঠাকুর, সবই বাসুদেব, কেবল এইটাই দেখা যায়। ঠাকুর ছাড়া আর কিছুই থাকে না। ঠাকুর ইচ্ছা করিয়া যাহা করান তাহাই করিতে থাকে, যাহা বলান তাহাই বলে। ঠাকুর সর্ব্ব সময়ের জন্য ভক্তকে রক্ষা করেন। জীবতত্ত্ব নিয়া কতদিন থাকা,—যতদিন মায়া। জীবতত্ত্ব ছাড়া হইলে তবেই তত্ত্বদর্শী হওয়া যায়, খাঁটি খাঁটি ভক্তি আসে, প্রেমে মন ও প্রাণ মাতিতে থাকে। মালা ও চন্দন কতদিন,—যতদিন জীবতত্ত্ব। ততদিনই মালা ও চন্দন দিয়া অন্তরে পূজা করা যায়, সেটা হইতেছে মানস পূজা। মানস পূজা কিছুদিন করা দরকার।

তত্ত্বজ্ঞানের জ্ঞানী হইলে কে কার পূজা করিবে তাহা বুঝিতে পারে না ও জানিতেও চায় না। জ্ঞানতত্ত্বে পরমাত্মার সহিত "আমি ও তুমি" ভাব থাকে না। মধুর ভাব ভক্তি তত্ত্বে, জ্ঞানতত্ত্ব অ-ছাড়া। জ্ঞানেতে সকলই ব্রহ্ম দেখা যায়। একো ব্রহ্ম দ্বিতীয়ো নাস্তি, ইহাই জ্ঞানের মূল। সাধনার পরিসমাপ্তি। আমি ব্রহ্ম, তুমিও ব্রহ্ম, সেও ব্রহ্ম, একই ব্রহ্মে মিলন। আর কোন চিন্তাই নাই, পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ওঁ শান্তিঃ। ভক্তি আর জ্ঞান, দুটিই সমান। কোন-টারই ভেদ নাই, অভেদ। চিন্ময়ের সঙ্গে মিলনমিশ্রণ। মধুর মিলন জ্ঞানে ও ভক্তিতেই হইয়া থাকে। যদ্যপি ভক্তি ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা দুই রকম বলিলাম, সাধক দ্বিধা ভাব করিবে না। জ্ঞান ভক্তি একই বস্তু। দুটিই পরম পবিত্র। যেই ভাবেই চলিতে চাও না কেন, একটি ধরিলেই আর একটি আসিয়া যাইবে। সেইজন্য ভক্তি ও জ্ঞান দুইটি সমান। একটি ছাড়া আর একটি থাকিতে পারে না। ইহারা হইতেছেন প্রকৃতি ও পুরুষ।

জীবনের সার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য অন্তরে দিব্য মনের সৃষ্টি করিতে হইবে। সৃষ্টিকর্ত্তা সকলের মন দিব্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীব কামনাবশে তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে। নিঃশেষ ভাবে কামনা ত্যাগ না করিলে মনের চাঞ্চল্য ভাব দূর হইবে না, জানিবে। মন অসার সংসারে বিকীর্ণ, সর্ব্বত্র হইতে সেটাকে সম্পূর্ণরূপে গুটাইয়া লইতে হইবে। মনকে আপন কর, তাহা হইলে মন আত্মার বিরুদ্ধাচরণ ত্যাগ করিবে। মন সম্পূর্ণরূপে আপন হইয়া গেলে সাধন পথে আর ভয় নাই। চঞ্চল মন সাধন পথের মহা কণ্টক।

বাহিরে ভিতরে একই সত্যবস্তু। তাহা ধরাধরি করিলে পাওয়া যায়। তত্ত্বদর্শী হইয়া অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানী হও। আত্মার উদ্ধার করিতে হইবে। পারমেষ্ঠ্য যোগে অন্তরে প্রবেশ কর। সর্ব্বদা কোমল মিষ্ট ভাব রাখ। লোকসঙ্গের স্পৃহা শূন্য। দ্বন্দ্বে অরুচি। হাস্য পরিহাস ত্যাগ। সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। মিথ্যা ব্যবহারে আতঙ্ক। আত্মঅহঙ্কার সমূলে বিনাশ। তত্ত্বদর্শীও সর্ব্বদা জাগ্রত। মোহ নিদ্রা শূন্য। জগতের হিতাকাংক্ষা। নিষ্ঠাবান। পরিত্যক্ত বস্তুর চিন্তা শূন্য। আত্ম চিন্তনে নিমগ্ন। সাত্বিক আহার বিহারে আনন্দ। নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার। জ্ঞান নিয়া সকলের সঙ্গে মিলামিশা। অজ্ঞান আসিলে দুঃখ। সুখ দুঃখ সমভাব। ভগবৎচর্চ্চায় ভিতরে আনন্দ। সর্ব্বদা ভগবদ্ভাবে মাতোয়ারা। সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণ। আত্ম-সমর্পণ হইলে আর কোনভাবের উদয় হয় না।

আমি আছি কি ভগবান আছেন ইহা না বুঝিয়া এক ভগবানকেই দেখিতে পাওয়া যায়। পরমাত্মা-চিন্ময়-গোবিন্দের সঙ্গে কায়া মিশিয়া থাকে। আবরণ শূন্য, এক অঙ্গ, আর দু'অঙ্গ থাকে না। যারা জ্ঞানতত্ত্বের জ্ঞানী তারা অজ্ঞান দেখিতে পায় না। যাহার পূর্ণভাবে জ্ঞান ফুটিয়াছে তাহার দেহে অজ্ঞানীর অঙ্গ স্পর্শে যন্ত্রণা ধরে। অজ্ঞান, অন্ধকার, কামনা ও বাসনার সংস্পর্শ জ্ঞানবান পুরুষ-প্রকৃতি সহ্যই করিতে পারে না। জ্ঞানীর চক্ষে সব জায়গাই চিন্ময়, আকাশ-পাতাল ভেদ নাই। আধ্যাত্ম জগতে নিত্যলীলা চলে। যাহার দৃষ্টিপথে সে লীলা আসিয়াছে সে অনিত্য লীলা

দেখিবে কেমন করে ? দয়া করিয়া ভগবান তাহাকে সব সময় মোহন করিয়া রাখেন। বাহিরের বস্তু দেখিলে তার মন আর মোহিত হয় না। দ্রষ্টব্য পথে চলিয়া যায়। সর্ব্বদা দৃষ্টি স্থির। কোন প্রকারে নয়ন-ফাঁকে অন্য কোন দৃশ্য পড়িলে তখনই অগুর চুরমার হইয়া যায়, সে সহ্য করিতে পারে না। জগদ্‌গুরু সচ্চিদানন্দ ভগবান একমাত্র পুরুষ। পরা প্রকৃতি রাধা তাহার সঙ্গিনী। সে পরম পুরুষের সঙ্গে মিলন করিতে গেলে রাধা সাজিতে হইবে। ভক্ত ভগবানকে আপনার স্বামী বলিয়াই জানে। সবই এক তিনি, তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই। যখন ভক্তের যেই ভাবের উদয় হয় ভগবান সেই ভাবেই দেখা দেন। মূলে এক অখণ্ড ব্রহ্ম নারায়ণ ছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই নাই।

(৩১)

মায়ের কৃপা

(১)

ইতিপূর্ব্বে মায়ের পুণ্যকাহিণীতে তাঁহার সাধনার স্তরে স্তরে নানাপ্রকার দর্শনের এবং অবশেষে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর পরমপদে মধুর ভাব নিয়া স্থিতির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সাধন সমাপ্তির পর পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমের অপূর্ব্ব সমন্বয় জীবনে প্রতিফলিত হইলে মায়ের মধ্যে গুরুভাবের বিকাশ হইল। তখন ঠাকুরের আদেশে তিনি কয়েকজনকে মন্ত্র দীক্ষা দেন।

কানে ফুকারিয়া মা কাহাকেও মন্ত্র দিতেন না। বীজমন্ত্র

লিখিয়া দিতেন, শিষ্য তাহা উচ্চারণ করিয়া মাকে শুনাইয়া দিত, মায়ের দীক্ষার এই প্রণালী ছিল।

কয়েকজন শিষ্য ও শিষ্যার এবং ভক্তের সাধারণ ও বিশেষ বিবরণ মা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন, এই হেতু গ্রন্থ মধ্যে তাহাদের নাম ও সাধারণ গূঢ় রহস্য মায়ের আদেশ মত লিপিবদ্ধ করা হইল। এই কয়জন ছাড়া মায়ের আরও কয়েকটি শিষ্য শিষ্যা আছে। তাহাদের সংখ্যা অল্প। শ্রীযুক্তা রাজবালাদিদি ও রত্নমণির নাম বইএর পূর্ব্বেই আসিয়া গিয়াছে।

দীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে মা এইরূপ বলিয়াছেন :—

আমার যখন সাধনার বিকাশ হইল তখন ঠাকুর আমাকে আদেশ করিলেন যে তোমার অমৃত ভাণ্ড হইতে কিছু বণ্টন করিয়া দাও। কোন কোন জীবকে তুমি উদ্ধার কর। যাহারা তোমার কাছে আকিঞ্চন নিয়া আসিবে তাহাদের দীক্ষা দিয়া আচার্য্যের কাজ কর। সাধনায় উন্নতি হইলে পরে কিছু বিলাইয়া দিতে হয়। তোমার ভাণ্ড পূর্ণ হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, সেইজন্য বলিতেছি দুই চার জনকে উদ্ধার কর। আমি বলিলাম, 'ঠাকুর', আমার ত ইচ্ছা করে না'। ঠাকুর বলিলেন, "তাহাতে কোন দোষ হইবে না। তুমি এখন ব্রহ্মে স্থিত হইয়াছ। ব্রহ্ম নাম নাও। তোমার কাছ হইতে যাহারা নাম লইবে তাহাদের উন্নতি হইবে। ভক্তি চাই। বিশ্বাস ভক্তি নিয়া যে ইহা ধারণ করিবে তাহাতে তাহার সাধনার উন্নতি হইবে আধার বিশেষে।"

ঠাকুর এই কথা বলার পর যাহারা আমার কাছে আকিঞ্চন

ভাবে দীক্ষা নিতে আসিত তাহাদের কিছু দান করা হইয়াছে। মন্ত্রদীক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—

১। শ্রীযুক্ত হরি ঘোষ, সন্ন্যাসীবেশে থাকেন। দেহ, মন, ধন দিয়া মায়ের যথেষ্ট সেবা করিয়াছেন। কাশীতে থাকেন।

২। শ্রীযুক্ত শম্ভুপদ মিত্র (লালু), চৌখম্ভা মিত্র বাড়ী, কাশী। তিনি ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শোভারাণী মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়াছেন, খুব সাত্বিক প্রকৃতি। ভগবানের প্রতি খুব ব্যাকুলভাব।

৩। শশাঙ্ক ব্রহ্মচারী—সর্ব্বদাই মায়ের কাছে থাকিতেন এবং আবশ্যক মত দৈনন্দিন সেবার কাজ করিতেন।

৪। শ্রীমতী হরিদাসী দেবী—এরা পতিপত্নী উভয়ই মায়ের শিষ্য। ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লইয়া সাধন-ভজন করে। তার পতি ষ্টেশন মাষ্টার।

"হরিদাসী আকিঞ্চন সদা করে মোরে,
সহস্রায় উঠিবে সে কহি এইবারে।
আকিঞ্চন ব্যাকুলতা আছে সর্ব্বক্ষণ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া করে নিশি জাগরণ।
কিছু কিছু পাইয়াছে আমার যে স্থানে,
ভক্তিভাব আছে তার কহি অনুক্ষণে।

৫। শ্রীমতী শেফালী—বালবিধবা, ১৮। ১৯ বৎসর আন্দাজ বয়স। তাহার পিতা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা

হাইকোর্টের উকীল ছিলেন, ২৪ পরগণার বারুইপুর নিবাসী। তিনি মায়ের কাছে দীক্ষা নেন নাই, কিন্তু অনন্যভক্ত।

"শেফালী যে কন্যা মোর হাহাকার করে,
বালিকা বয়স তার কহি যে সবারে।
সাধনাতে মন তার আছে সুনিশ্চয়,
ব্যাকুল হইয়া সদা কাঁদে সে নিশায়।"

৬। শ্রীযুক্তা বিধুমুখী দেবী, তাঁহার বয়স আন্দাজ ৮০ বৎসর। তিনি শেষ পর্য্যন্ত মায়ের ভোগ রান্না করিয়াছেন। তিনি আমাদের মায়ের গুরুভগিনী। শেষে তিনি সিদ্ধিমাতার কাছে দীক্ষা নেন, যেমন তাঁর গুরু-মা নিয়াছিলেন। বিধুমুখী বড় ঘরের মেয়ে, ভক্তিমতী, সর্ব্বদা নিঃস্বার্থভাবে মায়ের সেবা করিয়াছেন, মায়ের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

৭। শ্রীমতী শশীমুখী দেবী গুজরাতী, শ্রীযুক্ত গিরিধারী লাল ব্যাসের কন্যা।

"সুন্দর স্বভাব তার ভক্তিমন দিয়া,
আসন রাখে যে সদা হৃদয়ে পাতিয়া।
আনন্দে করিছে বালা আমার সেবন,
ভক্তিভাবে করে সদা গুরু আরাধন।
নানারূপ দর্শন পায় অন্তর মাঝারে,
বাজনায় মুগ্ধমন থাকে নিরন্তরে।

৮। শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন মহাশয় ঃ—

"গোবর্দ্ধন শিষ্য মোর গুজরাটী যে হয়,
আর্থিক ব্যবস্থা মোর করে সমুদয়।
ঠাকুরের ইচ্ছা তরে আসিয়াছিল ঘরে,
দেহ রক্ষার প্রায় তিন বৎসর আগে।
গুজরাটী সুন্দর কায়া ভক্তি ছিল তায়,
ভক্তিভাবে গুরু করি ধরিল আমায়।
ঠাকুরের ইচ্ছাবশে আনিল তাহারে,
আর্থিক ব্যবস্থা তিনি করিলেন পরে।"

"মে—র মাতাপিতা কিছুদিনের জন্য কাশীবাস করিতে আসিয়া ছিলেন। মে—ও তাহাদের সঙ্গে কাশী আসিল। এখানে লেখাপড়া করিত। প্রথম বয়স হইতেই ধর্ম্মে মতি ছিল। সাধুদের কাছে ঘুরিয়া বেড়াইত, কিন্তু কোন সাধুর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস হইত না। পরে সে আমার সন্ধান পায়। গোপীবাবুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল। কবিরাজও তাহাকে খুব ভালবাসিতেন। তার মাতাপিতা আমার কাছে যাওয়া আসা করিতেন। সেও আমার কাছে আসিত, তাহাতে তার কোন তৃপ্তি হয় নাই। পরে সে একদিন আমায় বলিল যে মা, আমাকে যদি কিছু না দেখান তাহা হইলে এ জীবন রাখিব না। তখন ঠাকুরের ইচ্ছায় সে আমার অঙ্গে নানা রকম দর্শন করিতে লাগিল। অঙ্গ হইতে নানা রকম মন্ত্রতন্ত্র পাইতে লাগিল। অদ্ভুত অদ্ভুত দর্শন করিয়া সে আনন্দে মাতিতে লাগিল। সুন্দরভাবে সাধন ভজন করিতে

লাগিল। সে অনেক রকম দর্শন করিয়াছে। আমার কায়া হইতে অনেক নির্গত বাণীও দেখিয়াছে। প্রায় রাতদিন সে আমার কাছে থাকিত, রাত্রি ১১। ১২ টার পর বাসাবাড়ী গিয়া শয়ন করিত। খাওয়ার আর শয়নের সময় বাড়ী যাইত, বাকী সারাদিন আমার কাছে থাকিত। তখন তার খুব গাঢ়রূপে ভক্তি হইয়াছিল। এই সব হওয়ার কিছুদিন পরে আমার কায়া থাকিতে প্রারব্ধ কর্ম্মবশে সে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করে। তারপর হইতে আমার সঙ্গে তার দেখা হয় নাই, সে নিজ দেশে চলিয়া গেল। আবার সে সাধন ভজন করিবে। তার ভগবানে লক্ষ্য আছে।"*

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মায়ের নিকট প্রায়ই যাইতেন। মা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং নিজের সব অনুভব তাহাকে বলিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে মায়ের বাণী—"আমার প্রথম সাধনকাল হইতেই পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ ভক্তিভাব নিয়া আমার কাছে যাওয়া আসা করিতেন। সাধনার সমস্ত কথাই তাঁর কাছে বলিতাম। প্রথম অবস্থায় আমার বলিতে লজ্জা বোধ হইত। ঘুমটা দিয়া কথা কহিতাম। লজ্জাবশে সম্মুখ হইয়া কথা বলিতে পারিতাম না। সাধন প্রণালী ঠাকুর আমায় সব বলিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি আমার মনে খটকা আসিত। সেইজন্য কবিরাজ

* মা জীবদ্দশায় আমাদের বলিয়াছেন যে উপরোক্ত ছেলের কাছে তাঁহার কায়া নির্গত বহু বাণী ও বীজমন্ত্র আছে। আমরা তাহার নিকট হইতে সে সব পাইবার অনেক চেষ্টা ও প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সব সুলভ হইয়া উঠিল না।

মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতাম। কবিরাজ মহাশয়ের মন সরল। সাধুর প্রতি তাঁহার খুব ভক্তি বিশ্বাস আছে। তিনি একজন সাধক। তিনিও ভগবানকে নিয়া লীলাখেলা করেন, সেইজন্য তাঁহার কাছে আমি সমস্ত কথাই জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। আমার যত সব সাধনা হইয়াছে, সবই তাঁহার কাছে প্রকাশ করিয়াছি এবং মীমাংসা করিয়া বুঝিয়া লইয়াছি। কবিরাজও জিজ্ঞাসুভাবে আমাকে বহু কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এমন সুন্দর আস্তে আস্তে কথা বলিতেন যে তাহা শুনিতে আমার খুবই ভাল লাগিত। আমার প্রতিও তাঁহার খুব ভক্তিভাব ছিল। তাঁর প্রতি আমার দৃষ্টি আছে।"

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, উত্তর প্রদেশের বেরেলী বিভাগের "ইন্সপেক্টর অব্ স্কুল্স্" ছিলেন। অবসর গ্রহণান্তে বর্ত্তমানে তিনি মিরাটের অন্তর্গত মোদীনগর নামক স্থানের "সায়েন্স এণ্ড কমার্স" কলেজের অধ্যক্ষ। মায়ের অনন্য ভক্ত। তিনি পরম সাধু প্রকৃতির লোক। মায়ের কাছে প্রায়ই যাওয়া আসা করিতেন। মা তাঁহাকে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন। তার কিঞ্চিৎ অংশ নীচে দেওয়া গেল :—

"শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি ভগবানের রাস্তায় সহজেই চলিতে পারে। ভগবানই জীবকে শান্তি দিতে পারেন। তিনি এক শান্তির আধার স্বরূপ। মিথ্যার কাছে সত্য বস্তু দাঁড়াইতে পারে না। মিথ্যা উপচারে পূজা হয় না। সত্যের পূজাই ভগবান

গ্রহণ করেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আস্তে আস্তে ত্যাগ করিতে হয়। ভগবানের রাস্তা সহজ ও কঠিন। ভক্তের কাছে সহজ বলিয়াই বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবানকে ভজিবার চেষ্টা করিলে তিনি আপনার জন বলিয়া মনে হয়। আপনার লোকের কাছে যাইতে সঙ্কোচ ও দ্বিধা থাকে না। সমন্বয় ভাবে সর্ব্বদা বিচার করা বিশেষ দরকার। ধ্যান যোগ যতটা পার তাহাই করিবে। বাহিরের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া যায় না। ভিতরের জ্ঞান-টাই হইল জ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান আসিলে জগৎটা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। আত্মশুদ্ধির চেষ্টা সর্ব্বদা রাখিতে হয়। আত্মশুদ্ধি করিতে বিশেষ কষ্ট নাই। জগতের ইচ্ছা ছাড়িয়া ভগবদ্ ইচ্ছা হইলে আত্মশুদ্ধি সহজেই হইয়া যায়। প্রাণ, মন দিয়া ইষ্টের চিন্তা করিতে হয়। স্থূল চিন্তায় লোকগুলি আত্মহারা হইয়া যায়। সে চিন্তার শেষ হয় না। এবং চিন্তা যত করা যায় ততই একটা না একটা বাড়িতেই থাকে। আনন্দ ত কোন প্রকারে আসিতেই পারে না। কেবল নিরানন্দের খনি। আনন্দময়ের চিন্তাতে ভিতরে আনন্দ বাড়ে। এবং তাঁহার আভাস চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিও হয়। ঠাকুরের ইচ্ছায় ভক্তের হৃদয় ক্রমান্বয়ে খুলিতে থাকে। আমিত্ব জ্ঞান যত হারান যায় ততই ভাল। ভিতরে অনুসন্ধান করিতে করিতে তবেই পথ পাওয়া যায়। মানস পূজা করা খুব ভাল। রাত্রিতে বেশীক্ষণ নিদ্রাটা ঠিক নয়। মানস পূজা প্রথমে শেষ রাত্রিই করিতে হয়। অন্তর দৃষ্টি হইলে সব সময় মানস পূজা চলে। খাইতে, শুইতে, চলিতে, ফিরিতে দেহের কুঠরীতে পরমাত্মার দর্শন

হয়। পরমাত্মা গোবিন্দ চিত্তে সর্ব্বদাই আছেন। চিত্তবৃত্তি লয় পাইলে তবে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। ভিতরের পদ্ম জ্ঞান হইলে আস্তে আস্তে খোলে। অন্তরের জ্ঞানই জ্ঞান, অন্তরের ধ্যানই ধ্যান। বাহিরে চোখ বন্ধ করিয়া অন্তরে চোখ চাহিয়া থাকিতে হয়। অন্তরে চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ আছে। অন্তর-সূর্য্য না খুলিলে দৃষ্টি ঠিক হয় না। দ্রষ্টব্য পথেও চলা যায় না। অন্তর সূর্য্যই হইতেছে পরম জ্ঞান। মন হইতেছে চন্দ্র। মন যখন নির্ম্মল হইয়া যায় তখন চন্দ্রের আকার ধারণ করে, শ্বেতময় প্রভা দেখা যায়। তামসিক ও রাজসিক বৃত্তি দিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধান করা চলে না। ভাব ও ভক্তি দুইটি বস্তুর বিশেষ দরকার। তুমি শান্ত প্রকৃতি। শান্তির চেষ্টা নিয়া সর্ব্বদা থাক। চেষ্টা শূন্য কখনও হইতে নাই। বিশ্বাসে বস্তু মিলিয়া যায়, তর্কে গোবিন্দ বহুদূর। তর্কে কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না। ঠাকুরের কল্পবৃক্ষে নানা রূপ ফল হয়। যে যাহা প্রয়াস করে গোবিন্দ তাহাকে সেই ফলই দিয়া থাকেন। চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজই নাই। মধুর ভাব ধরাই ভাল। ভক্তি-রাণীর কাছে ভিক্ষা চাওয়ার দরকার। ভক্তি বিনা শান্তি কোথাও নাই। ভক্তিতে প্রেম জন্মায়। প্রেমেও ডুবিয়া যাইতে নাই। জ্ঞান যুক্ত প্রেমই ভাল। সত্যজ্ঞান বিনা সত্যপ্রেম হয় না, দাঁড়ায় না।

মন্ত্র জাগাইবার জন্য ভিতরে চেষ্টা রাখিতে হইবে। মন্ত্র বল বড় বল। মন্ত্র যে ভাবেই আসুক না কেন তাহার প্রতি বিশ্বাস লইয়া ভক্তি রাখিতে হয়। প্রথমে করেই জপ করিতে হয়।

.....এই ভাবে করে জপ করিতে করিতে স্থিরতা আসিয়া যাইবে। মন্ত্র জাগ্রত হইলে অজপা জপ হয়। ভিতরে নাম চলিতে থাকে। অনিত্য বাসনাগুলি ক্রমে সরিয়া যায়। সে চেষ্টা নিজের কাছে। চেষ্টা-শূন্য কখনও হইতে নাই। মন শূন্য করিয়া ফেলিতে হয়। বাহিরে ও ভিতরে শূন্যভাব আসিলে পর ধৈর্য্য ও শান্তি আসিয়া যায়। অন্তরের শান্তি না হইলে শান্তির জিনিষ পাওয়া যায় না। সংসারটা অজ্ঞানে তমসাচ্ছন্ন। অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে তবেই সংসারের অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। আপনাকে আপনি চিনিতে পারে। "আমি, আমার" যেই দিন বুঝিতে পরিবে সেই দিন কাহার ও প্রতি আর মায়ায় আবদ্ধ হইয়া থাকিবে না। চিত্তবৃত্তি ক্রমান্বয়ে শান্তির দিকে চলিবে। মনের সাধনা করিতে হয়। মনটাই হইতেছে মহাপাজী, তাহাকে বশে আনা কঠিন হইয়া পড়ে। যখন মনটি তোমার স্থির হইয়া যাইবে তখন আত্মঅহঙ্কার লয় পাইবে। তাহার ও কোটি আছে। যেই কোটিতে যখন সাধনা হয় তখন মন সেই কোটিতে চলিতে থাকে। রজ ও তম এইগুলি নিয়া সাধন করিলে সাধনে উন্নতির আশা কমই। সত্বগুণ নিয়া সাধনা করিলে পর তবেই ভগবৎপথে চেষ্টা হয়। বিবেক, বুদ্ধি ও বিচার তাহাতে যোগ দেয়। সত্যজ্ঞানে হৃদয়ের মলিনতা দূর হইতে থাকে। বিচার করিয়া নিজের দোষগুণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। অপরের দোষ দেখিতে সকলেই পটু। পরমার্থ চিন্তা সকল জীবেরই করা উচিত। এই দেহটী চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণ ভঙ্গুর। সংসারে থাকিয়া

সাধন ভজন কর। বীরভাব অন্তরে রাখিবে। বীরভাব না হইলে অনিত্য সংসার ছাড়া যায় না। ক্ষমা, শান্তি ও দয়া এইটা নিজের মনে স্থাপনা করিবে। বিষয়বুদ্ধি যত ত্যাগ করা যায় ততই ভাল। অনিত্য বিষয়ে বিষ ভরা আছে। যতই হউক না কেন ততই লালসা বাড়িয়া যায়। সেই লালসার পূর্ত্তি কখনই হয় না। তাহা পূর্ণ করা কখনই হইবে না। ভগবৎপ্রেমে মতি ও গতি হইলে বাহিরের ব্যাপারগুলি আপনা হইতেই ভুল হইয়া যায়। সাধনায় চেষ্টা রাখা খুবই উচিত। তোমার বিষয় বুদ্ধি কমই আছে। সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ করিতে ভালবাস, এইটা খুব ভাল ইচ্ছা ভিতরের জিনিষ না পাইলে ত্রিগুণ রহিত হওয়া যায় না। স্তরে স্তরে পথ খুলিতে থাকে। পথে চলিতে নানারূপ বিঘ্ন আসে। সেই বিঘ্নগুলি কাটাইবার জন্য জ্ঞানের বিশেষ দরকার। জ্ঞান না আসিলে কিছু দূর উঠিয়া ও পড়িয়া যাইতে হয়। যেমন অন্ধের হাতের লাঠী না থাকিলে অন্ধ হাতড়াইয়া বেড়ায়, রাস্তা চলা কঠিন হয় তেমনি সাধকের জ্ঞানের লাঠী হাতে না থাকিলে নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মোহের অন্ধকারে এক স্থানে পড়িয়া যায়। ভগবানের মায়াচক্র ভেদ করিবার জন্য জ্ঞানত্রিশূল হাতে রাখিতে হইবে। পরমাত্মার তৃপ্তির জন্য আত্মসমর্পণ করা বিশেষ দরকার। ভগবানের চরণে দেহটাকে চিরদিনের জন্য সমর্পণ কর। আত্মীয় বন্ধুর প্রতি যে রকম টান আসে ভগবানের প্রতি তার সিকি অংশও টান দেখা যায় না। তাহাকে যদি এক সিকি ভালাবাসা

যায় তাহা হইলে তিনি ষোল আনা ভাল বাসেন তাহা বেশ ভালভাবেই বুঝিয়াছি। প্রেমের ঠাকুর ভক্তের কাছে বাঁধা থাকেন, কিন্তু তাহা বলিয়া ভাবে ডুবিয়া যাইতে নাই। চৈতন্য মহাপ্রভু প্রেমে ও ভাবে সর্ব্বদাই ডুবিয়া থাকিতেন। সে রকম ভাব ও প্রেম কয় জনার আছে? নিজেকে ভাব হইতে সর্ব্বদা সামলাইয়া লইতে হইবে, সংসারী জীবেরা তাহা না হইলে উপহাস করে। অন্তরে ভাব নিয়া ঠাকুরকে ডাকিতে হইবে। চৈতন্য জ্ঞানে চৈতন্য সমাধি হয়। অচৈতন্য ভাবাবস্থা ভাল নয়। দিব্যজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যভাবের সমন্বয়াবস্থা ভাল। মনে কাহারও সুখে সুখী ও কাহারও দুঃখে দুঃখী হওয়া ভাল নয়। সমতা থাকিলেই মঙ্গল। সমানভাবে সংসার আশ্রমে থাকিয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর। তাহাতেই সকল শান্তি আসিবে। জগতে অসার বস্তুর চিন্তা যত ছাড়িতে পার ততই ভাল। তাহা না হইলেই অমঙ্গল, তাহাতে মঙ্গল দেখা যায় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুখে ও দুঃখে বিচলিত হয় না। ধৈর্য্য ও সহ্য যত করা যায় ততই ভাল। তাহা বলিয়া অন্যায়ী, অত্যাচারীর দোষ ক্ষমা করিবে না। যতটা পার সংশোধন করিবার চেষ্টা রাখিবে। সেই সঙ্গে নিজেরও সংশোধন হইবে। পরম পিতার কাছে সকলই সমান। তবে তিনিও দোষগুণের শাস্তি দিয়া থাকেন। জীব তাহা বুঝিতে পারে না, তাঁহাকে দোষ দেয়। ভগবান কখনও নিজের সন্তানকে মন্দ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন না। অন্যায় কর্ম্ম করিয়া তাঁহাকে দোষ দেওয়া হয়। ঠাকুর যাহা

করান তাহাই করিতেছি আমাদের তাহাতে কী দোষ? এইগুলি সব অজ্ঞানীর কথা। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা কাহারও দোষ দেয় না। ভগবানের কথা ত দূরের কথা, মানুষকে ও দোষ দেয় না। কর্ম্ম ফলে যাহা আছে জ্ঞানী ব্যক্তি হাসি মুখে তাহা সহ্য করিয়া যায়। প্রারব্ধ ছাড়া কোন কাজই হয় না। সেই প্রারব্ধ খণ্ডাইতে হইলে সাধনা করিতে হইবে। সাধনায় সবই কাটিয়া যায়। মনকে শান্ত করিয়া লও। শান্তিপ্রিয় হইয়া ভিতরে থাক। অসার বস্তুগুলি একে একে ছাড়িবার চেষ্টা রাখ। বাহিরে যা দেখিতেছ সবই ভিতরে আছে। ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়। চিত্তবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে তবেই ভিতর খোলে।

এই কয়জন শিষ্য ও ভক্ত ছাড়া যে তিন জনার উপর মায়ের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হইয়াছে তাহাদের নাম ১। কৃষ্ণা সন্ন্যাসিনী —(মৌনীমা), ২। তরুবালা দেবী, ৩। ঋষিকুমার। মায়ের অসীম কৃপা বলে তাহাদের জীবন শতদল কিভাবে বিকশিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পর পর দেওয়া হইল, তাহাও মায়ের আদেশে।

(২)

কৃষ্ণা সন্ন্যাসিনী (মৌনীমা)

"প্রথম হইতে তার বৈরাগ্যেতে মন,
সংসারেতে নিষ্ঠা তার ছিল না কখন।

সাধু সঙ্গ নিষ্ঠা সদা মনেতে করিত,
সাধু দেখিবার তরে আকুল হইত।
যদি কেহ গেরুয়াদি বসন পরিয়া,
চলিয়া যাইত পথে তাহাই দেখিয়া।
তাহার চরণ ধরি মনের বাসনা,
গৃহস্থের বউ ছিল করিত যে মানা।
আকুল হইয়া দেবী বিরলে বসিয়া,
কাঁদিত ঠাকুর লাগি আপন বলিয়া।
বলিত কেমনে প্রভু পাইব তোমারে,
গৃহস্থ শাসন সদা করে যে আমারে।
পারি না সংসারে আর ভয় হয় চিতে,
লজ্জা ভয়ে রাস্তায় যে না পারি চলিতে।
কেমনে উদ্ধার হ'ব এই সংসারেতে,
নিশিদিন এই চিন্তা করিত মনেতে।
এইরূপে কিছুদিন সংসার করিয়া
পুত্র তার জেলে যায় স্বদেশী হইয়া।
তখন বিবেক ধরি আপনার কায়া,
ত্যাগ করে সংসারটি ছাড়িয়া সে মায়া।
পূর্ণভাবে মনের মাঝে গোবিন্দ লাগিয়া,
ধ্যান করে একমনে একান্তে বসিয়া।
তথাপি না দর্শন পায় করে কি উপায়,
হা কৃষ্ণ বলিয়া সদা কাঁদে উভরায়।

নানা দেশ পর্য্যটন করে অতিশয়,
কত সাধু সঙ্গ করে কহন না যায়।
তথাপি না দর্শন হয় কাহারো সঙ্গে,
হরিদ্বারে সন্ন্যাস যে নিল সেই রঙ্গে।
তাতে মন রঙ্গিল না কহি এই কথা,
কৃষ্ণা সন্ন্যাসিনী নাম হইল বারতা।
মনেতে যে শান্তি নাই বিচলিত তায়,
প্রভুপদ পাব বলি ঘুরিয়া বেড়ায়।
গোবিন্দ, গোবিন্দ বলি হাহাকার করে,
কিঞ্চিৎ দর্শন তার হইল যে পরে।
মন স্থির তাহার না হইল তাহায়,
পরে যে গোবিন্দ তারে মিলায় এথায়।
মৌনী মায়ের আখ্যান শুন এ বারতা,
দীক্ষা নিবার পূর্ব্বে তার এ সব কথা।
সুমতি সুস্থির সতী সর্ব্বদাই ধ্যানে,
পরে মন্ত্র দীক্ষা নিল আসি এই স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা নিয়ে বেটী বলিল আমারে,
তোমার কাছে নিলাম মন্ত্র কিছু নাই ঘরে।
তখন বলিনু আমি শুন এই কথা,
ধীরে ধীরে পাবে বস্তু ব্যস্ত কেন সদা ?
সবুরেতে মেওয়া ফলে এ কথা জানিবে,
প্রভু পদ পেয়ে তুমি আনন্দে মাতিবে।

স্তরে স্তরে পদ্ম তার বিকাশ হইল,
'কণিকা মালায়' * তাহা প্রকাশ করিল।
তত্ত্ব কথা অন্য কেবা বুঝিতে পারিবে ?
ঠাকুরের বাণী সেটা নিশ্চয় জানিবে।
সন্ন্যাসিনীর মনগড়া কিছু নাই তাতে,
লিখিয়াছে পুস্তক সে ঠাকুর আজ্ঞাতে।
আমার কাছে মন্ত্র নিয়া সকল পাইল,
সব চক্র ভেদ করি সহস্রায় উঠিল।
শূন্য মহাশূন্য আর কৈলাস পর্ব্বতে,
রহিল সে কিছু দিন সেথায় নিশ্চিতে।
ব্রজলীলা অগণন দেখেছে সুন্দরী,
দিব্য দিব্যভাব কত অনুভব করি।
নানারূপ দেব দেবী দর্শন করিয়া,
সমতা লইয়া সদা সাধন করিয়া।
পূর্ণরূপে সাধনাদি করিয়া সুন্দরী,
আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে হরি।
মহাগুরু কাত্যায়ণী হইয়া তাহার,
দিয়াছি ফুটায়ে দেহে সকল প্রকার।
নিজ দেহ জ্যোতির্ম্ময় দেখে অহরহ,
অন্তঃসূর্য্য অন্তরালে দেখে এক গৃহ।

---

* মৌনীমা রচিত পুস্তকের নাম।

তাহার ভিতর দেখে সুন্দর পুরুষ,
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তিনি হন জ্যোতির্ম্ময়।
রথ পরে শোভা করে সুন্দর হইয়া,
ওঁকারের মালা কত চৌদিক ঘেরিয়া।
দেখিয়াছে ব্রহ্মপদ পরম পদ আদি,
ব্রহ্মরূপে আপনারে ভুলে নিরবধি।
আত্মজ্ঞানে আত্মারে আপনি চিনিয়া,
আনন্দে মাতিয়া আছে তাহারে লইয়া।
সর্ব্বদা যে জ্যোতিভরা আপনার কায়া,
দেখে শুধু আপনারে দেখে না আর মায়া।
এইরূপে সাধন তার সমাপ্ত হইল,
ব্রহ্মপদে স্থির হয়ে এখন রহিল।
পরম ব্রহ্মে লয় হবে যে দিন মন,
সেইদিনে দেহ নষ্ট জানিবে তখন।
আর না দেখিতে পাবে পুত্র কন্যাগণ,
আর না দেখিতে পাবে আপনার মন।
পরম পদে স্থির হয়ে রবে না কখন,
দেহজ্ঞান হারাইয়া সচৈতন্য মন।
ব্রহ্মপদে আছে বলে দেহটি রয়েছে,
আত্মহারা হয়ে মৌনী তাহাতে মজেছে।"

(৩)

শ্রীতরুবালা দেবী *

ঢাকা জিলার অন্তর্গত প্রাণিমণ্ডল গ্রামে মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয় শুক্রবার, শুক্লা নবমী তিথি, (নবরাত্রে) আশ্বিন মাস, সন ১৩০০ বঙ্গাব্দ। পিতার নাম ৺ত্রৈলোক্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ৺মানদা সুন্দরী দেবী। দশ বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয় কাশীধামে। পতির নাম ৺কালী প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বনাথের কৃপায় বিবাহের পর হইতেই আমি কাশীধামে আছি। বাল্যকাল হইতেই পূজা সন্ধ্যা করিতে আগ্রহ ছিল। যতদিন মন্ত্র নেওয়া হয় নাই ততদিন মনের মধ্যে সর্ব্বদাই দুঃখ হইত। মনে হইত যেন আমি কোন আত্মীয় হারা হইয়া রহিয়াছি।

দশম বৎসরে আমি কাশীতে আসিয়া,
থাকিতাম নিরন্তর সংসার লইয়া।
বিচার আসিত মনে জানি নাই কিছু,
পরমপদ ব্রহ্মপদ কি জানিবে শিশু?
তথাপি ও মোর মনে হ'ত নিরন্তর,
মায়া মোহে ডুবে আছি লোকের ভিতর।
সর্ব্বদা যে মনে হ'ত পূজা সন্ধ্যা করি,
দীক্ষা নাই শিক্ষা নাই উপায় কি করি?

---

* তরুবালা দেবীর ভিতর সব কথা স্ফুরিত হইয়াছে, এজন্য নিজের কথা প্রকাশ করিতে আমি বাচক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।

এইরূপ কতদিন কাটিয়া যে গেল,
সর্ব্বদা অনল শিখা চিত্তেতে জ্বলিল।
দয়া করে স্বপ্ন যোগে গুরু দেখা দিয়া,
কুল গুরু মন্ত্র আমায় দিলেন বলিয়া।
মূল মন্ত্র পাই আমি স্বপ্নের ভিতরে,
গায়ত্রী বলিতে মোর নিদ্রা ভঙ্গ করে।
দেখিলাম স্বপ্নে মোর কুল গুরু মাতা,
কানে ফুকারিয়া মন্ত্র দিলেন দেবতা।
সেই মন্ত্র লয়ে আমি করি জপ ধ্যান,
লোকজনে জিজ্ঞাসিয়া চাহিনু বিধান।
তারা বলে মন্ত্র তোমার নিতে ত হইবে,
এই মন্ত্রে সিদ্ধি কার্য্য কভু না ফলিবে।
পরে আমার গুরু-মাতা কাশীতে আসিয়া,
রীতিমত কুল দীক্ষা দেন করি দয়া।
মানস উপচারে তখন পূজা করি,
হৃদয়েতে সর্ব্বদাই দেখতে পাই হরি।
ইষ্ট নাহি দেখে মোর তুষ্ট নহে মন,
আকুল চঞ্চল চিত্ত হ'ত অনুক্ষণ।
ভাল না লাগিত মোর সংসারের যত,
কি করি এখন ইহা সদা মনে হ'ত।
কোথা মিলে সাধুজন সেই মহাজন,
কে বলিয়া দিবে মোরে পথের সন্ধান।

এইরূপে কতদিন কাটিয়া যে গেল,
পরে মোর সৌভাগ্যের উদয় হইল।
ছিলেন জননী মোর বাড়ীর নিকটে,
সেইজন্য সৌভাগ্য ফুটিল মোর বটে।
যতদিন দুর্ভাগ্য মোর ছিল হৃদয়েতে,
অহঙ্কারে যাইনি আমি জননী নিকটে।
বলিতাম কত সাধু আসে কাশীধামে,
যেরূপ হবেন ইনি বলিতাম ভ্রমে।
বিশ্বাস না ছিল মোর তখন তাহাতে,
দিব্যভাবে আবির্ভূত আছেন ধরাতে।
কাশীতে অনেক সাধু দেখিয়া দেখিয়া,
বিশ্বাস হারায়ে ছিনু দুর্ভাগ্য বলিয়া।
কুল গুরুর দীক্ষা নিয়ে মন স্থির নাই,
কি করি উপায় আমি ভাবিতাম তাই।
এইরূপে কতদিন কষ্টেতে কাটিল,
প্রকাশ হইয়া মাতা তাই দেখা দিল।

আমার স্বামী আমায় বলিতেন যে তোমার বাড়ীর পাশে এমন সিদ্ধ সাধুমা আছেন, যাওনা কেন? এখানে ওখানে না ঘুরিয়া মায়ের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিলেই ত পার। তাহাতেও আমার মনে কোন প্রত্যয় হয় নাই এবং যাইও নাই। পরে একদিন অগ্রহায়ন মাসের শুক্লা একাদশী, বুধবার আমি মায়ের বাড়ী গেলাম। মা তখন নীচের তলায় দালানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

তখন আমি দেখিতে পাইলাম মায়ের ডান বাহুতে যুগল চরণ এবং কপালে ওঁকার ও মায়ের বুকের উপর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। তাহা দেখিয়া আমার মনে ভক্তি আসিল। তখন ভাবিলাম মায়ের সম্বন্ধে লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা ঠিক। সেই হইতে মায়ের বাড়ী যাওয়া আসা করিতে লাগিলাম এবং দর্শনও পাইতে লাগিলাম। প্রথম দর্শনেই আমার ধ্যানের সময় সিদ্ধিমাতাকে দেখিতে পাই, পরক্ষণে দেখি যে তিনি অন্নপূর্ণা রূপ ধরিয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন। আমি ও সন্ন্যাসিনী (মৌনীমা) দিদি দুই পাশে দাঁড়াইয়া সখী সাজিয়া চামর ব্যজন করিতেছি। এ রকম দর্শন আমার কিছুদিন চলিল। মায়ের কাছে গিয়া বলিলাম যে আমি আপনাকে অন্নপূর্ণা রূপে দর্শন পাই। মা বলিলেন, ভালই ত, অন্নপূর্ণা দর্শন পাইতেছ তোমার আর কোন অভাব থাকিবে না। তুমি ত সংসার নিয়া থাকিতে চাও না, অন্নপূর্ণা দর্শন করিলে যে যা চায় তাই পায়। তুমি ভগবানকে চাহিতেছ সে বিষয়ে তোমার অভাব পূর্ণ হইবে। অন্নপূর্ণার নাম পূর্ণ করিবার জন্য পরে আরও দর্শন পাইতে লাগিলাম, মায়ের কাছ হইতে দীক্ষা নেওয়ার আগেই। পরে মা আমাকে দীক্ষা দিলেন। সে অদ্ভুত দীক্ষা, মায়ের কায়া ভেদ করিয়া বীজমন্ত্র উঠিয়াছিল তাহা আমি দেখিতে পাইলাম। শক্তিমন্ত্র। নিজের দীক্ষার সম্বন্ধে আমি একটি অতি সুন্দর রহস্য ও সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। প্রথমে স্বপ্নাবস্থায় আমি যে ইষ্টমন্ত্র পাইয়াছিলাম সেটাই পরে কুলগুরু আমাকে দেন। এবং সেই বীজমন্ত্র পরে আমাকে

আমার শ্রীসিদ্ধিমাতা দেন ও সেটাই তাঁর গায়েও ফুটে উঠে। আমি ত কাহাকেও কিছু বলিতে বা পূর্ব্বাভাস দিতে যাই নাই। ভগবানের কৃপা সব। সে যাহাই হউক, মায়ের প্রতি আমার ভক্তি আরও গাঢ়রূপে বাড়িয়া গেল। মায়ের কাছে যখনই পূজা করিতে যাইতাম তখনই এক এক দিন এক এক রকম স্তুতি বাহির হইত এবং নানা রকম আধ্যাত্মিক কবিতা ও চণ্ডী ফুটিয়া উঠিত। আমি সে সব কিছুই জানিতাম না এবং ভাবের পরে আমার কিছু মনেও থাকিত না। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইত। তখন আমার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়া কেবল ভগবানের নাম নিতেই ভাল লাগিত। সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে বিরক্ত লাগিত এবং আহারাদি করিতে ইচ্ছা করিত না। মায়ের অসীম কৃপাতে আমি সকলই অনুভব করিয়াছি। যখন মায়ের কাছে যাইতাম তখন আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই থাকিত না। বাড়ীর কাজকর্ম্ম সারিয়া হয়ত ১১টায় যাইতাম। তিনটা বাজিয়া যাইত। স্তব, স্তুতি, গান এই সমস্ত হইতে হইতে ভাবাবেশে আমি বসিয়া থাকিতাম, আর কাঁদিতাম। তখন মা কাহাকেও আমার চোখে মুখে জল দিতে বলিতেন, ও বলিতেন ওকে বাড়ী পৌঁছে এস। আমি বাড়ী আসিয়া খাইতে বসিতাম কিন্তু সব ভুল হইয়া যাইত। শুধু ভাত খাইতাম, তরকারী প্রভৃতি নিতে ভুল হইত। এ রকম অবস্থা কিছুদিন গিয়াছে। মায়ের কৃপায় আমি সকল সূক্ষ্ম জগতের জিনিষের দর্শন পাইয়াছি। যাহারা সূক্ষ্ম জগৎ দেখিতে না পায় তাহাদের বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব। আমারও আগে এ রকম ভাব ছিল, এতে

মানুষের কোন দোষ নাই। মানুষ কি করিবে? মানুষ ত মোহ মায়ায় বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। গুরুগোবিন্দের কৃপা হইলে পর অসাধ্য সাধন হয়। মনের মানসে অকপটভাবে ভগবানকে ডাকিলে একদিন না একদিন তাঁহাকে পাওয়া যায়। এইটা আমি নিজে উপলব্ধি করিয়াছি। সেইজন্য বলিতেছি জগতে যত ভাই ভগিনী, মাতাপিতা আছ একবার আকুল হইয়া ভগবানকে ডাক। দেখিতে পাবে কেমন সুন্দর জিনিষ আছে। স্থূল জগতের জিনিষ তাহার কাছে সব তুচ্ছ। মায়ের কৃপায় আমি এমন সুন্দর জিনিষ দেখিয়াছি যে তাহা বর্ণনা করিতে পারি না, বর্ণনাতীত। কিঞ্চিৎ মাত্রই বলিতেছি :

যখন আমার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইল, তখন দেখিতে পাইলাম কুলকুণ্ডলিনীর উপর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি ত্রিনয়নী, দ্বিভুজা বাহু বিস্তার করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। আমার সিদ্ধিমাতা সেখানে বসিয়া আছেন। আমি বলিলাম, "মা, এ কি?" মা বলিলেন, "কুলকুণ্ডলিনী, তাহা কি জান না? উনি ঘুমাইয়া আছেন। তিনি জাগ্রত না হইলে ত তোমার দর্শন ঠিক ঠিক হইবে না।" আমি বলিলাম, কি করিলে জাগিবেন মা? মা বলিলেন, "তুই হাতে উনার পা চাপিয়া ধর। তাহা হইলে মা জাগিবেন।" তখন আমি দুই হাতে পা চাপিয়া ধরিলাম। মা তখন উঠিয়া বসিলেন। আমার সিদ্ধিমাতা তাঁহার অঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ত্রিনয়নী মায়ের একখানা লালপেড়ে কাপড় পরা ছিল। দেখিতে খুব সুন্দর। তিনি আমাকে বলিলেন, "চল,

তোকে নিয়ে এবার উঠি"। তখন দেখিতে পাইলাম, অন্নকূটের সময় যেমন বিশ্বনাথের বাড়ীতে সিঁড়ি থাকে সে রকম সব ছোট ছোট রূপার সিঁড়ি আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত রহিয়াছে। ভিতরে যেন আর কিছুই নাই, সব ফাঁক। মধ্যে মধ্যে একটী একটী পদ্ম। মা বলিলেন যে স্তরে স্তরে পদ্ম দেখিতে পাচ্ছত, এইগুলি সব পার হইতে হইবে। মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত যাইতে হইবে। আমাকে বলিলেন, এইসব গুলির মধ্যেই ঠাকুর আছেন। মন স্থির করিয়া চল, পূজা করাইয়া তোমায় লইয়া যাই। চতুর্থ দল পদ্মে শক্তিময়ী মাতা বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পায়ে আগে পূজা করিতে বলিলেন। পঞ্চমকার বেষ্টিত দলে ওঁকার শোভিত নারায়ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। ক্রমান্বয়ে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে মা আমাকে পূজা করাইতে করাইতে নিয়া চলিলেন হাত ধরে। চারিদিক হইতে শঙ্খ, ঘণ্টানিনাদ হইতে লাগিল এবং সকলে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "তরুর কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া স্তরে স্তরে তাহাকে লইয়া যাইতেছেন, তোমরা সব উলূ দাও।" আমি দেখিতে পাইলাম যত দেব-নারীগণ জ্যোতির্ম্ময়রূপে আসিয়া আনন্দ করিতেছেন। তাঁহাদের রূপ বড়ই সুন্দর। মায়ের কৃপাগুণে এই ভিতরের জিনিষ সব দেখিয়াছি। পরে সিদ্ধিমাতা আমার হাত ধরিয়া ক্রমান্বয়ে সিঁড়ি দিয়া লইয়া চলিলেন। কখন বা মাকে ত্রিনয়নী রূপেই দেখিতে পাইতাম, কখন বা সিদ্ধিমাতারূপে। পদ্মের রং হলদে, লাল, নীল, কাল, সাদা, অল্প অল্প নীল রং সাদার উপর। চতুর্থদল, পঞ্চদল,

ষষ্ঠদল, সপ্তমদল, অষ্টদল নবদল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল, হৃদয়ে শতদল, ব্যোমতত্ত্বে ষোলদল, আজ্ঞাচক্রে ত্রিদল, সহস্রায় সহস্রদল দেখিতে পাইলাম। একদিনের ধ্যানেই আমি এত সব দেখিয়া গুরুমাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন, এই সব আভাস দর্শন হইল, ঠিক এখনও হয় নাই। তবে কুলকুণ্ডলিনী তোমার জাগিয়াছে, এইবার আস্তে আস্তে এক জায়গায় স্থিতি হইয়া সপ্তচক্র ভেদ হইবে। পরে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি হইতে কিছুদিন অনাহতের ধ্বনি শুনিতে পাইতাম। মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুরে আমাকে বেশীদিন থাকিতে হয় নাই। হৃদয়ে সুন্দর শতদল পদ্ম। তাহার ভিতর প্রথম অবস্থায় দুর্গামূর্ত্তি পূজা করি, সামনে পূর্ণকুম্ভ, তাহার উপর ডাব নারিকেল, তার উপর একখানি রেশমীবস্ত্র, সাদা রং, বেনারসী ফুল, লালপাড়, আর চারিধারে নৈবেদ্য। পুষ্পপাত্রে অতসী, অপরাজিতা অনেক রকমের ফুল এবং ভোগরাগ অনেক। দেব বালক বালিকারা সব নৃত্য করিতেছে। দেখিতে পাইলাম আমার গুরুমা আমার দ্বারা পূজা করাইতেছেন। মা বলিলেন, দুর্গা পূজা কর দুর্গতি হইবে না। তখন আমি স্তুতি আরম্ভ করিলাম :—

নমস্তে ভবানী দুর্গা প্রণমি তোমারে,
সর্ব্বদা দুর্গতি হর তুমি মা আমারে।
নারায়ণী বিষ্ণুমাতা জননী আমার,
সংসার সাগর হ'তে কর মোরে পার।

এবার ভুলিয়া মাগো আছি অহঙ্কারে,
আর যেন ভব রোগে পড়ি না সংসারে।
তুমি মাতা সুরেশ্বরী সুরেশ জননী,
মহামায়ারূপে তুমি জগদাচ্ছাদিনী।
তব মোহমায়া বদ্ধ যত জীবগণ,
করুণা করিয়া মাতা দাও শ্রীচরণ।
সংসারেতে যাতায়াত অনিত্য লইয়া
সত্যবস্তু তুমি মাতা তোমায় ভুলিয়া।
তব মায়া মোহে মাগো পড়িয়া সংসারে,
প্রারব্ধ বশেতে তারা নিত্য ভোগকরে।
সহিতে না পারি মাগো সংসার যাতনা,
বিষয় বাসনা মোরে দিও না কামনা।
দুর্গতি না কর দুর্গা বলি বারে বারে,
রক্ষা কর কাত্যায়ণী তুমি মা আমারে।
পার কর ভবানী মা ভবের কামিনী,
ভবদারা হও তুমি হর সুহাগিণী।
কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণা প্রণমি তোমারে,
ফেল না দুস্তর ঘোর সংসার সাগরে।

জয় জয় সিদ্ধিমাতা সকল রূপেতে হেথা,
দুর্গারূপে দিলে দরশন।
ভবের মায়া কাটাইতে দুর্গা তুমি হৃদয়েতে,
দক্ষিণা কালী হও মা কখন।

লোল জিহ্বা দিক্ বাসনা, করি তোমার উপাসন,
তুমি সর্ব্ব কাল বিনাশিনী।
মায়াকাল হরিবারে মহাকালী ত্রিসংসারে,
মহাকালের হৃদয় বাসিনী।
চামুণ্ডা চণ্ডমুণ্ডা মা ভয়ঙ্করী রূপিণী,
অসুর সংহার কর খল খল হাসিনী।
মুণ্ডমালা লয়ে হও ভক্তরিপু নাশিনী,
প্রণমি তোমার পায় সিদ্ধিমাতা রূপিণী।

এই রকম যখন যাহা দর্শন হইত তখন স্তব ও গান ভিতর হইতে উঠিত। মা তাহা শুনিয়া খুব আহ্লাদিত হইতেন। আর বলিতেন, তরুর মুখে কখন গান ও স্তব শুনি নাই। ঠাকুর তরুকে খুবই কৃপা করিয়াছেন। মায়ের কৃপায় সাধকের যে সব দর্শন করিবার দরকার মা আমাকে সবই করাইয়াছেন।

একদিন ধ্যানে বসিয়া আছি, দেখিতে পাইলাম যে কণ্ঠদেশে, ব্যোমতত্ত্বে একটি পদ্ম, তাহাতে শিব শয়ন করিয়া আছেন। শুনিতে পাইলাম ইহার নাম ব্যোমতত্ত্ব। সূক্ষ্মে মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মা, একি? মা বলিলেন, ইনি জ্ঞানময় শিব, এখানে শয়ন করিয়া আছেন, ইনি না উঠিলে জীবের জ্ঞান হয় না। তখন আমি কর জোড়ে স্তব করিতে লাগিলাম। স্তবটি এই :—

হর মহেশ্বর মম দুঃখ হর.
দীনহীন হই আমি
পরম পুরুষ তুমি হে মহেশ
জ্ঞানদাতা হও তুমি।

অজ্ঞান আঁধারে পড়িয়া দুস্তরে
মায়ামোহ অন্ধকারে।
অজ্ঞান হইয়া তোমায় ভুলিয়া
আছি সংসার মাঝারে।
করুণা করিয়া ত্রিনয়ন দিয়া
জ্ঞান আঁখি দেও মোরে।
তুমি না উঠিলে নয়ন না খুলে
মায়াসূত্র বাঁধে মোরে।
করি আকিঞ্চন তোমার চরণ
ভোলানাথ নাম ধর।
ভোলা মহেশ্বর তুমি দিগম্বর
দুঃখ আমার হর।
বিশ্বম্ভর রূপে সংসার বিষকূপে
ফেলিও না আর মোরে।
উঠ উঠ নাথ রক্ষ হে শ্রীনাথ
অনাথিনী তাই ডাকে।
প্রণাম করি হে তোমার চরণে
এ বর দাও শঙ্কর।
জ্ঞান ফুটাইয়া অজ্ঞান নাশিয়া
ত্রিনয়ন খোল হর।

এই রকম স্তব করার পর দেখিতে পাইলাম মহেশ্বর উঠিয়া বসিলেন। শুদ্ধ কলেবর, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, মাথায় জটা,

পায়ে খড়ম রূপার, একহাতে ত্রিশূল, অন্যহাতে ডম্বরু। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি চাও? বোম্ বোম্ রব করিলেন। আমি বলিলাম, প্রভু আমি আর কিছু চাই না, কেবল তোমাকে চাই। সংসার বিষ হইতে আমাকে উদ্ধার কর।" কিছুদিন পর ধ্যানে বসিয়া আছি। দেখিতে পাইলাম কপালের উপর চক্ষু ফুটিয়া গেল। বাণী হইল, ত্রিনয়ন খুলিল। মা সূক্ষ্মে বলিলেন, তোমার এবার ত্রিনয়ন খুলিল।

ত্রিনয়ন খুলিবার পর আশ্চর্য্যরূপে দর্শন হইতে লাগিল। ব্রজের যত রকম লীলা সবই দর্শন হইতে লাগিল। মাকে বলিলাম, মা, এসব দর্শন হইতেছে। মা বলিলেন, লীলা দর্শন না হইলে ত ব্রহ্মের ঘরে যাওয়া যায় না। ক্রমে ক্রমে সব লীলাগুলি দর্শন হইল। যখন সব চক্র ভেদ হইতে লাগিল, তখন গুরু-মাকে ভিতরে দেখিতে পাইলাম। মা ধনুর্ব্বান লইয়া উপর দিকে বান ছাড়িয়া বলিলেন, তোমার সপ্ত পদ্ম ভেদ করিয়া দিলাম। মায়ের অদ্ভুত রূপ :—

কিছুদিন পর দেখিতে পাইলাম আজ্ঞাচক্রে ত্রিকোণ-পদ্ম। তাহার মধ্যে একটী ওঁকার। ওঁকার বেষ্টিত নারায়ণ বসিয়া আছেন। সুন্দর জ্যোতি চারিদিকে, হৃদয়ের ভিতরে দেখিলাম শুভ্রবর্ণ সূর্য্য। বাণী হইল যে অন্তঃসূর্য্য খুলিয়াছে। কিছু দিন পর সহস্রার দর্শন হইল। শুনিতে পাইলাম, সহস্রার আভাস কিছুদিন পর আত্মার দর্শন হইল। একখানি মুখ মূলাধার হইতে উপরে উঠিতেছে। তাতে কাচের মত আবরণ আছে। বাণী হইল

আত্মা—আত্মা। পরে ক্রমে ক্রমে সেই মুখখানি সপ্ত ছিদ্র দিয়া সহস্রার মধ্যে গিয়া বসিয়া রহিল। বাণী হইল, সহস্রায় পৌঁছিলে। পরে দেখিলাম মাথার উপর একটা খাবড়া ঢাকা রহিয়াছে ও গুরুমা সেখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সিদ্ধিমা বলিলেন, তোমার সহস্রার ভেদ করে দি?

আমি বলিলাম, হ্যাঁ, করে দিন। তখন তিনি পায়ের গোড়ালি দিয়া আঘাত করিলেন। আঘাতে সেটা ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার ভিতর হইতে জ্যোতি বাহির হইল। দেখিতে পাইলাম সহস্রদল পদ্ম। তাহার মধ্যে একখানি সিংহাসন রূপার। তাহার উপর শিব পার্ব্বতী বসিয়া আছেন। চারিদিকে সহস্রবাতি জ্বলিতেছে। বাণী হইল, মহামিলন দর্শন। কিছুদিন পরে সহস্রার উপর শূন্য পথ দেখা গেল। সেখানে আর কিছুই নাই, কেবল আকাশ। তাহার ভিতর একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ, ওঁকার সংযুক্ত। গুরু বলিলেন, এই শূন্য। তাহার কিছুদিন পর দর্শন হইল শূন্যের উপর মহাশূন্য। অল্প নীল আভা, সাদা রং, জ্যোতির্ম্ময় ওঁকার। তাহার অর্দ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ একটি পুরুষ। বাণী হইল, মহাশূন্যের আভাস। কিছুদিন পর সেই মহাপুরুষ, আমার গুরুমা আমাকে বলিলেন, এবার মহাশূন্যে স্থিত হও। এইরূপ ভাবে নানা রকম দর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে বাণী হইতে লাগিল। কত নদ নদী, স্বর্গলোক, মর্ত্তলোক মর্ত্তলোকের একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। ভিতর দিয়া গবাক্ষদ্বার, তাহার মাঝে মাঝে অন্ধকার ও মাঝে মাঝে একটি তৈল প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহা দেখিয়া আমার ভয় করিতে

লাগিল। আমি সূক্ষ্মে গুরুমাকে বলিলাম, মা, আমি ওখানে যাইতে পারিব না। মা বলিলেন, চল, পাতাল দেখিবে না? তখন মা আমার হাত ধরিয়া একটী আলো হাতে করিয়া পাতালে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিতে পাইলাম চতুর্ভূজ নারায়ণ। তিনি খুবই জ্যোতির্ম্ময়। তিনি একটি রত্ন সিংহাসনে বসিয়া আছেন। পরে গুরুমা সেখান থেকে পাতালে নাগলোকে লইয়া গেলেন। আমার সেখানে গিয়া খুব ভয় হইল। কত রকমের যে নাগ—সহস্র ফণা, দশ ফণা, ইত্যাদি। সাপেরা গর্জ্জন করিতেছে শুনিয়া আমি ভাবাবেশে ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা বলিলেন, থাম, থাম, কায়ার ভিতর এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে তোমাকে সব দেখাইয়া দিতেছি। এইরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক, যমলোক, গন্ধর্ব্বলোক, অপ্সরালোক, সপ্তলোক, সপ্ত পাতাল সব গুরু কৃপা করিয়া আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন। গুরু মায়ের অঙ্গে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছি। আমার মন বিক্ষিপ্ত হইলে ব্রহ্মময়ী গুরুমা আমাকে নানারকম উপদেশ দিয়া মন শান্ত করিয়াছেন। আমি আর বিশেষ কি বর্ণনা করিব? গুরু কৃপায় চিদাকাশে বুদ্ধদেব চন্দ্রের ভিতর দেখিয়াছি চিন্ময়। এবং হৃদয়ে চিন্ময় মহাপুরুষ সর্ব্বদাই দর্শন করিতেছি। মহাগুরু সিদ্ধিমাতার কৃপায় কোন রকম দর্শনের আমার আক্ষেপ নাই। তবে প্রারব্ধবশে কিছু চঞ্চল আছি, সেটাও আমার গুরুরই কৃপা। কারণ আমি গুরুর কাছে প্রার্থনা করিয়াছি যে যতক্ষণ আমার দেহ থাকিবে, নিজের কাজ কর্ম্ম নিজে করিব এবং মানুষের কাছে গণ্য মান্য হইব না। আপনি

আমায় গোপন রাখিয়া দিন। মা আমাকে তাই বলিয়া গিয়াছেন, তুমি বীর কন্যা হইয়াই থাকিতে পারিবে। লোকের কাছে মান্য গন্য হইলে মনে সর্ব্বদাই অহঙ্কার হয়, আমার ঠাকুর পাছে চলিয়া যান। আমি সেইজন্য এভাবেই থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার ঠাকুর ও আমাকে এইরূপ করিয়াছেন। মায়ের আশীর্ব্বাদে আমি খুব আনন্দে আছি।

মা, তুমি আমায় সংসার হইতে বিদায় দিয়াছ, বিদেশ হইতে স্বদেশ পথে টানিয়া নিয়াছ, জন্মের মত সংসার যন্ত্রনা ঘুচাইয়াছ এবং আমাকে নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছ। পরম পতি লাভ করিয়া আমার জন্ম সফল। সর্ব্বদা তাঁহার রাতুল চরণ দর্শন করি ও নিশিদিন তাঁহার সেবা করি। দিবারাত্র তাঁহার কথা শুনি এবং আনন্দে প্রেমাশ্রু তাঁহারই জন্য ঝরে। মা, তুমি আমার সিদ্ধি-মাতা, তোমাকে বার বার প্রণাম করি।

মায়ের দেহ রক্ষার পর আমার মনের অবস্থা :—

আমি সর্ব্বদাই গুরুকে সহস্রায় কিংবা হৃদয়ে দেখিতে পাই, জ্যোতির্ম্ময় রূপ। আমার যখন যা দরকার হয় গুরু গোবিন্দ আমাকে তা বলিয়া দেন। অহর্নিশি ঠাকুরের দর্শন ও তাঁহার সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা চলে। চলিতে, ফিরিতে, কাজকর্ম্ম করিতে সর্ব্বদাই আমি ঠাকুরকে দেখিতে পাই। শয়নে স্বপনেও তাঁহার দর্শন হয়। আমার সব স্বপ্ন কেবল ভগবানকে নিয়া হয়। রোজই গান কি স্তব ভিতর হইতে শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। ইহা অনুভব না করিলে কেহ বুঝিতে পারে না। এতে কাহারও

দোষ নাই। আমিও আগে এসব বুঝিতাম না। মানব জন্ম দুর্লভ। হেলায় হারাইতে নাই। সফল করার জন্য চেষ্টা করাই দরকার। গুরুর চরণ সর্ব্বদা ধরিয়া থাকিলে একদিন না একদিন সফল হবেই।

ভিতরে যে কত সুন্দর জিনিষ আছে তাহা আপনারা চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবেন। আমার একান্ত ইচ্ছা সকলে দেখিয়া জীবন সফল করুন। কোন জিনিষই একা দেখিলে আনন্দ হয় না। গুরুর কৃপায় আমি এখন আনন্দে আছি। মায়ের স্বধামে যাওয়ার পর আরও বেশী রকম জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিতে পাইতেছি। সেখানে আর কিছুই নাই, কেবল জ্যোতিঃ। জ্যোতির ভিতর এক মহাপুরুষ বসিয়া আছে, ওঁকার বেষ্টিত। বাণী হইয়াছে-মহাবিষ্ণু।

সর্ব্ব সময় দেখি আমি হৃদয় আকাশে,
চতুর্ভূজ রূপে মাতা রহেন অক্লেশে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্বেত বর্ণ ধারী,
হৃদয়ে বিরাজ করেন বিষ্ণু রূপ ধরি।
মুখখানি মায়ের মতন দেখিবারে পাই,
উৎপল নয়নী মাতা দেখি যে তাহায়।
নানারূপ কথা আমায় বলেন যখন,
মায়ের মতন কণ্ঠস্বর শুনি যে তখন।
হৃদয় পদ্মাসনেতে স্থিতি হয়ে তায়,
রয়েছেন সিদ্ধিমাতা দেখি সর্ব্বদায়।

অঙ্গে অঙ্গে মিলন মাতা করিয়া আমারে,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয় দেখিয়া তাঁহারে।
আকাশে রবির মত জ্যোতিঃ হয়ে আছে,
চন্দ্র সূর্য্য শোভা দুই পাশেতে রয়েছে।
মন চন্দ্র প্রণাম করে চরণ ধরিয়া,
সর্ব্ব সময় এক অঙ্গ রয়েছি মিশিয়া।
ওঁকার বেষ্টিত কায়া কি বলিব তায়,
পদ্মসম দেহখানি দেখি সর্ব্বদায়।
আহার নিদ্রায় আর চলিতে ফিরিতে,
শ্বেতবর্ণ জ্যোতিঃ আমি দেখি চারিভিতে।
অহঙ্কার চূর্ণ হেতু জ্ঞান কথা শুনি,
সোঽহং শব্দে সর্ব্বক্ষণ হইতেছে ধ্বনি।
তুমি আমি ভাবে সদা মিলন করিতে.
ঠাকুরের সঙ্গে সদা রব এ ভাবেতে।
গুরু ব্রহ্ম জানি মনে গুরু সর্ব্ব ধন,
গুরুই আমার সব গুরুই নারায়ণ।
এক মনে এক ধ্যানে গুরুর সেবন,
গুরু বিনে কেহ নাই জেনেছি এখন।
কেবা কার স্বামী পুত্র কেবা কার ভাই,
গুরুই আমার বন্ধু জানি সর্ব্বদায়।
ভবে পার করেন গুরু কর্ণধার হয়ে,
নির্ম্মল করেন গুরু জ্ঞান কথা কয়ে।

আত্মসমর্পন হেতু গুরুর সেবন,
তাহা বিনে কর না মন অন্য আকিঞ্চন।
ভুলায়ে দেয় গুরু যত কামনা বাসনা,
যদি কেহ করিতে পারে গুরু উপাসনা।
সর্ব্বরূপে শান্তি পায় কহি সর্ব্বজনে,
মনের মলিন ঘোচে গুরু আরাধনে।
অহং তত্ত্ব ভুলে যাও ওরে মূঢ় মন,
চন্দ্রের মত নির্ম্মল থাক সর্ব্বক্ষণ।
পবিত্র হইয়া সদা আরাধনা করি,
সম্পদে বিপদে বন্ধু গোবিন্দ মুরারী।
সদ্‌গুরু ঈশ্বর বন্ধু জানিয়াছি মনে,
কান্ত বলি সপিয়াছি আত্ম সমর্পণে।
হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু প্রণমি তোমারে,
রাধার মত প্রেম-ভক্তি দিও ত আমারে।
মায়িক জগত যত ছাড়াইতে হরি,
জ্ঞান ভক্তি সদা দাও তুমি দয়া করি।
অজ্ঞানেতে অন্ধকার দিয়ো না যে আর,
দয়াকরে আলো দিয়ে রাখ এইবার।
আমি আমার ভুলায়ে দাও জগত মাঝারে,
তুমি মোর মহাপ্রভু রহো ত অন্তরে।
বালক হইতে প্রভু ঝঞ্ঝাবাত দিয়া,
রেখেছিলে মায়া শৃঙ্খলে বন্ধ করিয়া

আর নাহি বন্ধ হ'ব তব করুণায়,
কৃপা করে জ্ঞান খড়্গ দিয়ো সর্ব্বদায়।
দাসীর মিনতি রাখ ওহে নারায়ণ,
গুরুরূপে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছ যখন।
চিন্ময় ঈশ্বর তুমি হৃদয়েতে স্থিতি,
শূন্য মহাশূন্যে আছ কমলার পতি।
সহস্র মিলন হয় তোমার দয়াতে,
গোলোকেতে আছ তুমি দেখি আচম্বিতে।
পরম পদের কিবা রূপ বর্ণিতে না পারি,
সব জায়গায় আছ তুমি দয়াময় হরি।
তুমিও আমার প্রিয় আমি যে তোমার,
এ অধীনে চরণ দিয়ে রাখিলে এবার।
বাদ্য ভাণ্ড নিনাদেতে আকুল করিলে,
পরম পদের মহা জ্যোতি দেখাইলে।
আত্মজ্ঞান দিলে হরি দয়া করি মোরে,
তত্ত্বজ্ঞান বুঝাইলে তুমি বারে বারে।
ওঁ শান্তিঃ পরমাগতি বলিলে ডাকিয়া,
সোঽহং শান্তিঃ কর তুমি ভিতরে বসিয়া।
বাহিরের যত ব্যাপার দিবে ত ছাড়িয়া,
আমি তোমার পতি পুত্র দেখ না চাহিয়া।
আমি শান্তি আমি ভক্তি ভক্তের কারণ,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য করি ভজো সর্ব্বক্ষণ

হরে কৃষ্ণ হরে রাম নাম ত জপিবে,
বিষ্ণু নামে মহাশক্তি সর্ব্বদা পাইবে।
কালী তারা মহাবিদ্যা আমি যে তোমার,
মাতারূপে পালিব তোমায় এইবার।
শিক্ষক রূপে শিক্ষা দিব জ্ঞান শিবরূপে,
ভক্তি দিব রাধারূপে কহি যে তোমাকে।
বৈরাগ্য লইবে সদা যোগী রূপ ধরি,
সন্ন্যাসী হয়ে যাও সংসার নাশ করি।
ইন্দ্রচন্দ্র বায়ু বরুণ সকলি যে তায়,
সর্ব্বরিপু নাশ কর কহি যে তোমায়।
আমি আদি আমি অন্ত আমি মধ্য দেশে,
বিরজা সুষুম্না নাড়ী দেহ মধ্যে আছে।
অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ বায়ু সর্ব্বদা রাখিবে,
দৃষ্টি স্থির করে সদা আমাকে ভজিবে।
ভক্ত জনের এই কথা কহি তোর কাছে,
সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখে নিজ চেষ্টা বশে।
তাহাতেই হয় সদা দৃষ্টির স্থিরতা,
আমি তোমার গুরু রূপ রহিব সর্ব্বদা।
এইরূপে নারায়ণ বলে সর্ব্বক্ষণ,
তাহাতে আকুল মন হয় ঘনে ঘন।
ঠাকুরের কৃপা বিনে নাই ত জগতে,
সেই জন্য থাকি আমি সদা যে নিভৃতে।

শান্তি চিত্তে থাকি সদা তাঁহার কৃপায়,
ইষ্টবিনা মিষ্ট নাই:বলি যে সবায়।

গান

সদা হরি গুণ গাই, নাচিয়া বেড়াই,
হরি ছাড়া আর কেহ নাই।
আমি আমার হরি, আমি আমায় ধরি,
আমি আমার যতন করি।
আমার বলিয়া, আমার করিয়া,
আমার পরান জুড়াই।
আমি আমার আছি, আমায় ভাল বাসি,
আমি ছাড়া আর কেহ নাই।
সদা হরির নাম করি হরির নাম ধরি,
হরির নামে নাচিয়া বেড়াই।
ভবে হরি ছাড়া আর কেহ নাই।

(৪)

শ্রীমান ঋষিকুমার

রীবাঁ রাজ্যের একগ্রামে ভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯৭২ বিক্রম সম্বতে (১৯১৬।১৭ইং) ঋষিকুমারের জন্ম হয়। তাহার বাল্যকাল হইতেই ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল অভিভাবকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাধু মহাত্মাদের দর্শন করিতে যাইত। ১০।১২

বৎসর বয়সে সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করে। জপ, ধ্যান, পূজা, সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপ, গীতা ও রামায়ণ পাঠ বাল্যকাল হইতেই করিত। দুঃখী আতুরের সেবায় আনন্দ পাইত। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে, সূর্য্য সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের জন্য। কুলের প্রথানুসারে ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। পত্নীর প্রতি সর্ব্বদা মাতৃভাব পোষণ করিয়াছে। একবার বাধ্য হইয়া শ্বশুরবাড়ী যায় এবং সুবিধা পাইয়াই সেখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। বাড়ীর লোকেরা তাহাতে বিরক্ত হইয়া পড়ার খরচ পত্র সব বন্ধ করিয়া দেয়। ইং ১৯৩২ সালে হিন্দী মিডিল পরীক্ষা পাশ করে এবং ১৯৩৩ সালে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। সেই সময় কোন ঘটনা দেখিয়া তাহার মনে হয় পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান হয় না। স্থির করিল যে সন্ন্যাস নিয়া ভগবানের অনুসন্ধান করিবে। রাত্রিতে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন পাহাড়ে চলিয়া গেল। সেখান হইতে তাহার পরম শ্রদ্ধাভাজন হিতৈষী হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বদরীপ্রসাদ নিগম মহাশয়ের নিকট যায়, তিনি তাহাকে গীতাপাঠ করিয়া শুনান, ইতি পূর্ব্বে তিনি তাহাকে অনেক সৎগ্রন্থ পড়িতে দিয়াছিলেন। সন্ন্যাস নেওয়া স্থির হইল এবং মায়ের অনুমতি নিতে বাড়ী গেল। বাড়ীতে সকলে বাধা দিলে মাঘের অর্দ্ধরাত্রে গৃহত্যাগ করিল গুরুগোবিন্দের অনুসন্ধানে। যোগীরাজ স্বামী বলরাম দাসজীর নিকট উপস্থিত হইল এবং শিবরাত্রির দিন তিনি তাহাকে সন্ন্যাস দিলেন। তিনি তাহাকে হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগের প্রক্রিয়াদি শিক্ষা দিলেন। সে সব শিখিতে ৬ মাস

লাগিয়াছিল। গুরু সেবায়ও অষ্টাঙ্গযোগ সাধনে ৪ বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন হঠাৎ তাহার মনে হইল এসব যোগে কিছু নাই, কই ভগবান লাভ ত হইল না? পরে শ্রীবলরাম দাসজী মহারাজের কাছে বিদায় নিয়া পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দাশ্রমে গেল। আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা হইল না, স্থানীয় পুলিস ইন্সপেক্টরের বাড়ীতে প্রায় ৩ মাস ছিল, শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পায় নাই। তাঁহার শিষ্যদের কাছে যোগ সাধনপ্রণালী শিক্ষা করিত ও সেইরূপ সাধন ভজন করিত। তিনবার পণ্ডিচেরীতে যায় ও শেষবার শ্রীঅরবিন্দের দর্শন পায়। তাঁহার দর্শনে ও গ্রন্থাদি পাঠে অনেক উপকার হয়। ত্রিচিনাপল্লীতে গিয়া শ্রীরমণ মহর্ষির দর্শন করিয়াছে, তিনি তাহাকে প্রকৃতি পুরুষ বিবেক শিখান।

সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীর দিকে ঝোঁক ছিল বলিয়া সে পূজ্যপাদ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী, পঃ জহরলালজী ও মহাত্মা গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসে, ২।৩ মাস গান্ধীজীর আশ্রমেও ছিল।

কিছুদিন পর ভগবান লাভ হইল না ভাবিয়া মন অত্যন্ত আকুল হইল। এক নির্জ্জন বনে, ঝরনার ধারে দুই ঘণ্টা কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় বেহুঁস। তখন দেখিল অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষ, শতশত মুখ, শতশত হাত ও শতশত চোখ। তিনি তাহার দিকে চাহিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বাহ্য-জ্ঞান হারা। তখন হইতে অন্য সব সাধনা ত্যাগ করিয়া হরিনাম জপ ও ধ্যান করিত এবং যখনই ব্যাকুল ভাব আসিত

তখনই পুনঃ সেই রূপ অথবা কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যানে দেখিতে পাইত। সেই সময় প্রথম কাশী যায়, গঙ্গার ধারে তিন দিন অনাহারে থাকার পর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসার পণ্ডিত জীবন শঙ্কর যাজ্ঞিক জীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তাঁহার বাড়ী যায় এবং সেখানেই থাকিয়া যায়। কাশীতে সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত শিখিতে থাকে। এইভাবে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে মাঝে মাঝে দর্শন হইত। মন চঞ্চল হইলে পরমহংস দেবের জীবনী ও উপদেশ পড়িত কিংবা তাঁহার ছবির পূজা করিত। শ্রীযুক্ত গীতানন্দজী মহারাজের নিকট ৩।৪ মাস নিয়ম পূর্ব্বক গীতা পড়িয়াছে, মালব্যজীর কাছেও কিছু উপদেশ পাইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পঃ গোপীনাথ কবিরাজের নিকট প্রায়ই যাইত এবং সন্দেহ ভঞ্জন করিত। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বাগানে রাত্রে ধ্যান করিতেছিল, দেখিতে পাইল মা কালীর সঙ্গে পরমহংসদেব, দেদীপ্যমান মূর্ত্তি, শুনিতে পাইল, 'মাতৃগুরুর অনুসন্ধান কর, মায়ের উপাসনা করিতেই হইবে, মায়ের কৃপা বিনা কিছু হইবে না'। পঃ গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়কে এ সব বলিলে তিনি শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার অনুমতি নিয়া তাহাকে মায়ের কাছে নিয়া যান।

প্রথম দর্শনেই মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করে, পরদিন তাহার দীক্ষা হয়, ১৬ই এপ্রিল, সন ১৯৪১, বুধবার। মায়ের নির্দ্দেশ মত ধ্যান জপ চলিতে লাগিল। প্রায় সারা রাত্রই জপ ধ্যান

কীর্ত্তন ও ক্রন্দনে কাটিত। এইরূপ ৬ মাস কাটিয়া গেল। আশা ছিল ঠাকুর তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিবেন, সেরূপ হইল না। ধ্যান যোগে দর্শন হইত, এরূপ ত পূর্ব্বেও হইত। মায়ের কঠোর সাধনা ও অপূর্ব্ব অনুভবের কথা শুনিয়া ধারণা হইল, ভগবান নিশ্চয় আছেন এবং তিনি সর্ব্বস্ব ধন। মায়ের কাছে অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মা বলিলেন, কাজ কর, ঠাকুর মজুরী দিবেন। মায়ের স্থূল শরীরের উপর অনেক দিব্যবাণী ও ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া মায়ের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি বাড়িয়া গেল। মায়ের কায়াভেদী বাণীর এক এক হস্ত লিখিত প্রতি মায়ের প্রত্যেক শিষ্যের কাছে ছিল। সেও তাহার প্রতিলিপি করিয়া দৈনিক পাঠ করিতে লাগিল। মায়ের নিকট একদিন অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রার্থনা করিল, 'মা, শুনেছি সকলেই আপনার শরীরে মন্ত্র, বাণী, ঠাকুরের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছে, কৃপা করে আমাকেও কিছু দেখান, তাহা না হইলে আমার বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় ও স্থির হইতেছে না। আমি নিজের চক্ষে না দেখিলে কিছুই স্থির ধারণা করিতে পারিতেছি না'। মা বলিলেন, 'যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তাহলে দেখিবে, যা হয় সব তাঁর ইচ্ছাতেই হয়'। এইভাবে কিছুদিন গেল। একদিন শ্রী যাজ্ঞিকজী, শ্রীমান ও আরও কয়েকজন মায়ের ঘরে বসিয়া ছিলেন। মায়ের কপালে ওঁকার বেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি উঠিল। সকলেই দেখিতে পাইল। তারপর একদিন আমি, ঋষিকুমার ও আরও দুএক জন ফুল চন্দন দিয়া সকালে মায়ের পূজা করিয়াছিলাম। মায়ের কপালে ঠাকুরের

সুন্দর দুখানা চরণ উঠিল খুব স্পষ্টভাবে। মা নিজের হাতে সে চরণ দুখানির উপর চন্দন তুলসী চড়ালেন ও তুলসীখানা ঋষি-কুমারকে খাইতে দিলেন। সেইদিন হইতে গুরুগোবিন্দের প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস ভক্তি জন্মায়। সে তীব্রভাবে কঠোর সাধন ভজন করিতে লাগিল। সে প্রাণপাত সাধনা আরম্ভ করিল। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। একাসনে বদ্ধ কুঠরীতে ২৪ ঘণ্টা ধ্যান ও জপ চলিতে লাগিল, ভোজন এক বেলা আধসের আন্দাজ দুধ। এইরূপ ৬ মাস কাটিয়া গেল। ছবির মত নানা দেব দেবী দর্শন হইতে লাগিল। তাহাতে তৃপ্তি হইল না, ব্যাকুলতা বাড়িয়া গেল এবং জীবন দুর্ব্বহ হইল।

টেবিলের উপর পরমহংসদেব ও সিদ্ধিমায়ের ছবি ছিল, মাঝে মাঝে দেখিত সিদ্ধিমা ঐ টেবিলে বসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিতেছেন, 'চল, আমার কাছে আশ্রমে চল।' এদিকে মায়ের বাড়ী আসিয়া দেখিত, মা তাহার প্রতীক্ষায় আসনে বসিয়া আছেন এবং আমি (তরুবালা) বাড়ীর দরজায় তাহার জন্য দাঁড়াইয়া আছি। তাহার যা দর্শন হইত মা বা আমি নিজ হইতেই বলিতাম। অনেকবার এইরূপ হইয়াছে।

এত সব হওয়া সত্বেও তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই, শুধু তাঁহার ছবি দর্শনে কি হবে? ভগবান লাভ হইল কৈ? ভগবান পূর্ণ, পূর্ণ হওয়া চাই। প্রাণ বিসর্জ্জন নিশ্চয় করিল।

'দর্শনাদি সব অপূর্ণ, পূর্ণ বস্তু ক্রমে ক্রমে আসে না, পূর্ণ, অখণ্ড রূপেই আসে'। এসব কথা বলিয়া মাকে প্রণাম করিয়া

কাশী শহরের বাহিরে চলিয়া গেল। আদি কেশবের নিকট এক কুটিরেতে ৮।১০ দিন ছিল। গলা শুকাইলে একটু জল মুখে দিত। তাহাও ছাড়িল। রাত দিন ধ্যান জপ চলিল, অনেক দর্শন হইত, কিন্তু সব ছবির মত। একদিন শুনিল, "গুরুমা ডাকছেন, তাঁর কাছে যাও।" ধীরে ধীরে চলিল, শক্তি নাই। ২।৩ জন যাত্রী তাহার অবস্থা বুঝিয়া নৌকায় বসাইয়া মায়ের কাছে নিয়া গেল। মা খুব যত্ন করিলেন। তখন অনেক সময় মায়ের কাছে থাকিত। অসহ্য ব্যাকুলতা হইলে বাড়ী ছাড়িয়া ৭।৮ দিন গাছ তলায় বসিয়া থাকিত, অন্ন জল গ্রহণ করিত না। পুনরায় মায়ের কাছে আসিত। এইভাবে ৫।৬ মাস গেল। অবস্থা উন্মাদের মত, ভগবানের জন্য পাগল।

কাশী ছাড়িয়া প্রয়াগে শ্রীযুক্ত লালা মনমোহন দাস টণ্ডন (বাচ্চাজীর) প্রসিদ্ধ রামবাগে * গিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। এখানে আসার পর ভিতরে 'স্থিতি' আসিতে লাগিল। সর্ব্বদা মহাশূন্যে স্থিতি, ঠাকুর তাহার দিকে তাকাইয়া আছেন। চাঞ্চল্য দূর হইয়া গেল, ভিতরে ও বাহিরে শান্তি, ভিতরে সর্ব্বদা নীলাকাশ, শূন্যভাব দেখিত।

একদিন শুনিতে পাইল, মা ডাকিতেছেন, কাল তার আসিবে। তার আসিল এবং কাশীতে মায়ের কাছে উপস্থিত হইল। মায়ের শরীর খুব দুর্ব্বল, অত্যন্ত দুঃখ হইল। মায়ের বাড়ীতে দেড়মাস আন্দাজ অত্যন্ত বিরহভাব নিয়া সাধনা করিল। তারপর একদিন

* এই বাগানে মালব্যজী কায়াকল্প করিয়াছিলেন।

ভাগ্যোদয় হইল, ঠাকুরের কৃপা হইল। যে সব দর্শন হইল প্রত্যক্ষ, জীবন্ত, ছবির মত নয়। দৈবাৎ তাহার চক্ষুর তুটি তারা পূর্ণমাত্রায় ভিতরে উলটিয়া গেল, চেষ্টা করিয়া নয়। বাহিরের কোন জিনিষ দেখিতে পায় না, অন্ধপ্রায়, হাত ধরিয়া স্থানান্তরে নিতে হইত।

ভিতরে দর্শন হইল দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী নিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাহার চক্ষুর তুটি তারা ঠাকুরের পাদপদ্মের তুটি অঙ্গুষ্ঠের নখে অচলভাবে স্থির হইয়া আছে, ভাব শান্ত। প্রথম তিন দিন এই দর্শন হইল, তারপর বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া যায়। ভিতরের জ্ঞান পূর্ণরূপে ছিল। পরে দর্শন হয় যুগল রাধাকৃষ্ণের চতুর্ভুজ বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণের লয় এবং কৃষ্ণরাধায় লয়। নানাপ্রকার বহু দর্শন হইয়াছে। ত্রিশূলধারী শঙ্কর একা, সমস্ত দেহের ভিতর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মা তুর্গা, গণেশ ও শিব মূলাধারে গোলাকারভাবে বসিয়া আছেন। ঠিক ঠিক দর্শনের সময় বাহির ভিতর এক হইয়া যায়, কোন ভেদ থাকে না। ভগবান সর্ব্বদাই ভিতরে থাকেন। পরে দেখিল যে মূলাধারে শিব শুইয়া আছেন ও মা মহাকালী তাঁহার বুকে দাঁড়াইয়া আছেন। পরে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রে দেখিল যে শিব মায়ের চরণ ধ্যান করিয়া শুইয়া আছেন এবং মা তাঁহার বুকের উপর। তারপর দেখিল যে ছয়চক্রের প্রত্যেক শিব ওঁকার ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সকলে মিলিয়া এক শিব ও এক মা হইয়া সহস্রায় গিয়া একাসনে বসিলেন। যখন শিব ওঁকার রবে উঠিলেন তখন একটী অদ্ভুত ব্যাপার হইল।

তখন তাহার মুখ দিয়া প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্বনি

খুব মধুর উচ্চরবে বাহির হইতে লাগিল, অনেকে শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। পরে দেখিল তাহার দেহে নিজেই শিব হইয়া শুইয়া আছে, মা মহাকালী বুকে দাঁড়াইয়া আছেন। মা জাগিলেন, সে উঠিয়া চরণ ধরিল। নিজের সম্পূর্ণরূপ শিবের। আজ্ঞাচক্রে গণেশরূপ খুব বেশী দর্শন হইত, পরে নিজকেই গণেশরূপে দেখিল। গণেশ, মা, শিব সবই ত্রিনয়ন, গণেশের দেহ ওঁকার স্বরূপ। মানুষের দেহ ও ওঁকারময়। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক চক্রে কুণ্ডলিনী সর্প দেখিয়াছে। শিব শক্তির জাগরণ হইলে প্রত্যেক চক্রের সর্পটি ও সহস্রায় উঠিয়া ওঁকার উচ্চারণ করিয়া শিবের অঙ্গ বেষ্টন করিল, তাহার ও তিন চক্ষু।

তাহার যখন ত্রিনয়ন খুলিয়া গেল, তখন শুধু সূক্ষ্মেই নয়, স্থূলেও ভ্রুমধ্যে ত্রিকোণ চক্র হইয়া গেল, উপস্থিত সকলেই দেখিয়াছে। অনেক ধূম্ররাশি আজ্ঞাচক্র হইতে বাহির হইয়া গেল, তারপর দেখিল সুন্দর নেত্র। ঐ ত্রিনয়ন খোলার পরই নিজকে শিবরূপে দেখিয়াছিল।

অন্তর্মুখী দৃষ্টি খোলার পর নিজের ভিতর সব কাল দেখিল। তখন মহাকালী খড়্গ নিয়া দেহের উপর নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঐ নৃত্যের জন্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে মায়ের বড় বড় চরণ ফুটিয়া উঠিল। উপস্থিত সকলে দেখিয়াছে। মায়ের নৃত্যের ফলে কাল রং লাল এবং লাল নীল রং এবং পরে সব জ্যোতির্ম্ময় হইয়া গেল। সর্ব্বাঙ্গে নানা দেবদেবীর চরণ চিহ্ন এমন কি মশারীতে চরণের ছাপ পড়িয়া গেল। ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ শোভিত দুটি ওঁকার বেষ্টিত চরণ

বুকের উপর স্থাপিত হইল, মহাবিষ্ণুর পাদপদ্মই ভক্তের পরমপদ। একদিন দেখিল সহস্রার উপর শূন্যে মা ত্রিনয়নী দাঁড়াইয়া আছেন। ভিতরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দেখা গেল, দেখিল মায়ের চক্ষের পলকে সকলের পলক পড়ে এবং তাঁহার ক্রিয়ায় জগৎ ক্রিয়াশীল।

একদিন নিজকে রাধারূপে দেখিল, ঠিক স্ত্রীর মত সব অঙ্গ গয়না পরা।

আর একদিন দেখিল মূলাধারে কেবল পৃথিবী, সমস্ত ভূতল ভগবানের লীলাক্ষেত্র, কখনও লীলা শিবশক্তিরূপে, কখনও রাধা-কৃষ্ণরূপে, কখনও সব এক হইয়া মিলিত। পরে স্বাধিষ্ঠানে দেখিল কেবল জল, ঠাকুর জলক্রীড়া করিতেছেন। মণিপুরে অগ্নিই অগ্নি। এইরূপ হৃদয়ে বায়ু, কণ্ঠে আকাশ। আজ্ঞাচক্রে দেখিল ত্রিকোণ, এটা ব্রহ্মযোনি—বিশ্বযোনি, ভিতরে শুনিতে পাইল ওঁকার।

একবার দেখিল মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সব চক্রে এবং তার উপরে মাথা ভেদ করিয়া কেবল সূর্য্য, সূর্য্যের ত্রিনয়ন। দেখিল সূর্য্যের ভিতর ওঁকার, শেষে সূর্য্যের আকার ওঁকারে লয় হইয়া গেল। তখন বাহিরে ভিতরে সব ওঁকারময় ও ওঁকার বেষ্টিত দেখা যাইত।

একবার দেখিল মানুষ পশু আদি সকলের মধ্যে স্ত্রীজাতি সব রাধা, আর পুরুষজাতি সব কৃষ্ণ, আবার দেখিল সংসারে সব স্ত্রী দুর্গা, সব পুরুষ শিব।

একবার দর্শন হইল মানুষ পশু আদি সব নাম রূপ, কেবল

পঞ্চভূতের স্তূপমাত্র। স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া কিছুই নাই, সব জীবের ভিতর ত্রিনয়নযুক্ত সূর্য্য, তখন শুনিতে পাইল লিঙ্গ মিথ্যা। কায়া পঞ্চভূতের বিকার, আত্মালিঙ্গাতীত।

একদিন দেখিল সমস্ত পৃথিবী জলে, জল আগুনে, এই ক্রমে সব মহাশূন্যে মিশিয়া গেল, পরে ক্রমে ক্রমে পুনঃ সৃষ্টি হইল। শুনিতে পাইল ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একই তত্ত্ব আছে। ব্রহ্মপদ, গোলোক ও পরমপদ দেখিয়াছে।

যখন ভিতরে নাদ শুনা যাইত তখন বাহিরে কোন শব্দই শুনা যায় নাই। বহু বাঁশী, সেতার প্রভৃতির ধ্বনি শুনিয়াছে।

এইরূপ ৮।১০ দিন গেল, পরে চেষ্টাদ্বারা ধ্যান ভাঙ্গান গেল এবং বাহিরে আনা হইল, সেখানে সূর্য্যকে দেখিয়া সমাধিস্থ। দেখিল বাহিরের সূর্য্য ঠিক সূর্য্য নয়, যথার্থ সূর্য্যের উপর কাচের আবরণ মাত্র। তাহার ভিতর দিয়া গোলোক দেখিতে ছিল, গাভীগুলিকে দেখিল ওঁকার বেষ্টিত।

হৃদয়ে একটী সূর্য্য দেখিতে পাইত—দিবারাত্র।

একদিন দেখিল অত্যন্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এই দেহের ভিতর, স্থূল চক্ষেই দেখিত। বাড়ীর দেওয়ালের উপর ও সর্ব্বত্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বিদ্যুতের মত জ্বল জ্বল করিতেছেন। কখনও মনে হইত দেহের ভিতর সেই ঠাকুর, কখনও 'মা' এবং কখনও 'আমি' রূপে, সেই 'আমি' অথবা সেই 'তুমি'। মনে হইল তিনিই সব হইয়া রহিয়াছেন।

মায়ের দেহ রক্ষার পর সে দেখিল মায়ের বিগ্রহ যখন লোকেরা

বাহির করিল, তখন গুরুমা তাহার বুকে আসন পাতিয়া বসিলেন এবং ঘাট পর্য্যন্ত অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। যে কারণে তাহার স্থিতি পূর্ণরূপে হইতেছে না সব বলিলেন ও উপায় বলিয়া দিলেন। একদিন দর্শন হইল ঠাকুরের যুগল চরণ, চরণের ছুটি নখে নয়ন স্থির। তাহার দৃষ্টি চরণ অনুসরণ করিয়া বহুলোক লোকান্তর, সূর্য্যাদিলোক ভেদ করিতে করিতে শেষে মহাশূন্য হইয়া পরমপদ পর্য্যন্ত গেল। পথে নানা দৃশ্য।

(৩২)

(ক)

কায়াভেদী বাণী বলি তোমাদের কাছে,
সাধন সময়ে মোর অঙ্গে ফুটিয়াছে।
ভিতরে উজ্জ্বল বাণী দেখি স্তরে স্তরে,
স্বর্ণ বর্ণ অক্ষর যে কিবা শোভা করে।
বীজ মন্ত্র হয় তায় দেখি যে অক্ষর,
ভিতরে ফুটিয়া উঠে স্থূলের উপর।
ছাপা অক্ষরের মত অঙ্গেতে ফুটিত,
ছুই এক জন মিলে লিখিয়া লইত।
ললাটে মুখের মাঝে বিশেষ করিয়া,
নানা অক্ষর তারা দেখত নিরক্ষিয়া।
উপদেশ কত সুন্দর বর্ণনাতীত,
দেখিয়া লিখিত তারা অতিশয় ধীর।

সর্ব্বদায় নিকটেতে বসিয়া থাকিয়া,
লিপিবদ্ধ করে তাহা বাণীত বলিয়া।
জীবন্ত অক্ষর হয় ঠাকুরের কথা,
নানারূপ ছন্দ কত দেখে যে সর্ব্বদা।
এইরূপে কায়াভেদী বাণী হয় হেথা,
ঠাকুরের অঙ্গ বলি ফুটিত সর্ব্বদা।
বাহ্যজ্ঞান শূন্য মোর নিরন্তর থাকে,
গোবিন্দের সঙ্গে কথা হয় নানাভাবে।
উপদেশ ছলে প্রভু অঙ্গের উপরে,
আপন ইচ্ছায় ফোটে ভিতরে বাহিরে।
অঙ্গে ফুটিত যখন বাণী সমুদয়,
ফুলিয়া উঠিত অঙ্গ দেখি সর্ব্বময়।
বসিয়া থাকিত মোর কাছে যেই জন,
বাণীর অক্ষর তাতে দেখিত তখন।
জ্যোতির্ম্ময় হয়ে বাণী অঙ্গের উপরে,
দিব্যভাবে প্রকাশ হয় কি কহি কাহারে।
সর্ব্বসময় একনিষ্ঠভাবেতে মগন,
প্রফুল্ল হৃদয় হয় দেখিয়া তখন।
হরি কথা বিনে অঙ্গে দেখি না ত আর,
শ্বেতময় তার রূপ দেখিত বাহার।
এক অঙ্গে মিলে থাকি ইষ্টের সহিতে,
আনন্দে প্রফুল্ল মন থাকে এভাবেতে।

যাহারা লিখিয়া লয় কিছু নাহি জানি,
পশ্চাতে শুনি যে আমি এই দেব বাণী।
উজ্জ্বল বরণ তায় সুন্দর দেখিয়া,
সর্ব্বদা চাহিয়া থাকে মুখ নিরক্ষিয়া।
জিহ্বা অগ্রে কত বাণী দেখে সেই জন,
আশ্চর্য্য মানিয়া তাহা লিখিত তখন।
জগতের সার তত্ত্ব বুঝাইতে হরি,
এইরূপে লিপিবদ্ধ করান মুরারী।
সাধনে উন্নত যারা দেখিবারে পায়,
অভক্তের কাছে এটা উপহাস প্রায়।
আপন ইচ্ছায় আমি জানি নাত কিছু,
সর্ব্ব সময় একভাবে গোবিন্দের শিশু।
মনস্থির প্রাণ স্থির হইবারে পারে,
ধৈর্য্য ধরি যদি কেহ সাধনা ত করে।
আশ্চর্য্য অঙ্গের উপর বাণীর প্রকাশ,
সত্যভাবে দেখায় হরি হইয়ে বিকাশ।
কত রূপ বাণী ছন্দ লিখিয়া ত ছিল,
আমার নিকটে তাহা কিঞ্চিত আসিল।
তোমরা পাইলে যাহা হরির ইচ্ছায়,
দিব্যভাবে বাণী এই জানিবে সবায়।
শুনো বাছা তোমার কাছে বলিনু আমি,
প্রকাশ করিও তাহা গ্রন্থকারে তুমি।

অনুজ্ঞা দিলাম তোরে শেষের সময়,
দেহখানি ভব হ'তে যাইবে নিশ্চয়।
শান্তমনে স্থির চিত্তে সর্ব্বদা থাকিবে,
আপনাতে আপনি বাছা আনন্দ লইবে।

(খ)

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমায়ের কায়া-নির্গত বাণী

(১)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১—ব্রহ্ম প্রাপ্তির—দ্বার রক্ষক দেবদেবি-গণের ধারণাতীত, জাগ্রত, প্রসন্নরূপে, গোলোকে, ব্রহ্মভাবে, নিত্য লীলা যোগদানে অধিকার।

(২)

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১—সমগ্র দেবদেবতাগণ মুক্তনির্দ্বন্দ্বভাবে মোক্ষপথের চিরগুহ্য সন্ধানদানে বৈকুণ্ঠে সত্যরূপে প্রকাশশীল।

(৩)

২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১—মহান মিলনমিশ্রণ সংঘটিত গোলোকের চিরগুহ্য ব্রহ্মময় এই অভিব্যক্তি অভাবনীয়রূপে লীলাকারে জগতে মহাইচ্ছাবলে প্রকাশ।

(৪)

২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১—আত্মদর্শন যোগসিদ্ধি ব্রহ্মময় গোলোকে অধিকার লাভের একমাত্র মূল। তথায় স্থিতি ও নিত্যলীলাধিকার মহাকৃপাসাপেক্ষ।

(৫)

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১—এ ডাক জগতে অজ্ঞাত, এ গভীরতম গোলোকভেদী ডাক। গোলোকের মধুময় লীলারসাস্বাদন এই ডাকেই সম্ভবপর। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের একমাত্র সন্ধান এই জাগ্রত নামাবলী।

(৬)

২৬শে জ্যৈষ্ঠ, '৪১—গোলোকের ভগবান অত্যাশ্চর্য্য অদ্বিতীয়। এখানে দেবতাগণ সত্যে পূর্ণরূপে ব্রহ্মভাবে জাগ্রত। অনাদিকাল পরে আমারই মহাইচ্ছাবলে দেবদেবিগণের এই পরিণতি। তাই আজ এই ডাকার মত ডাক।

(৭)

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, '৪১—সত্যপথের গুহ্য সন্ধান ও বিবরণ

"জাগ্রত কুণ্ডলিনী"

এই জাগরণ দেবদেবিগণের কৃপাব্যতীত অসম্ভব। তারপর মূলপ্রকৃতি দর্শন, মহামিলন, আত্মদর্শন। এই পর্য্যন্ত জাগ্রত শিব-শক্তির প্রাধান্য। অতঃপর পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জাগ্রত ব্রহ্মমন্ত্র। পথের শেষ গোলোক। এই গুহ্যাতিগুহ্য সংবাদ।

(৮)

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, '৪১—জাগ্রত মন্ত্রের প্রভাব অতুলনীয়। এই রামনাম মহাপাপক্ষয়কারী। গোলোক-লীলার দেবতাগণ সকলেই ব্রহ্মভাবাপন্ন বটে কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্ব সম্বন্ধ বিরহিত ও নামশূন্য। ওঁকারই ব্রহ্মের একমাত্র বিকাশ।

(৯)

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১—কেবলমাত্র কৃপাই পূর্ণত্বের একমাত্র সম্বল। এই কৃপা ভিন্ন জাগ্রত মন্ত্র প্রাপ্তি দুরাশামাত্র। রাম-কৃষ্ণ-রুদ্র মোক্ষ প্রাপক। ওঁকার প্রচণ্ড মন্ত্র।

(১০)

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, '৪১—গোলোকের দেবতাগণ মহানন্দে মগ্ন। অগণিত পাদপদ্ম দেবতাদেরই চরণ। লীলায় দেবতাদের বিকাশ বিভিন্ন বটে কিন্তু দেবতাগণ একাত্মা ও পূর্ণব্রহ্মভাবাপন্ন। এখানে কাহারও প্রভেদ নাই। একই অনন্তরূপধারী ও বহুরূপের লয় একই পূর্ণ-ব্রহ্মে।

(১১)

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, '৪১—ক্ষণে ক্ষণে আমার স্মরণই পূর্ণত্বলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। মীমাংসা জ্ঞানের দৃঢ়ভিত্তি। গোলোক জ্ঞানময়, গোলোক মধুময়, গোলোক আনন্দময়, গোলোক ব্রহ্মময়, গোলোকই পূর্ণ।

(১২)

৩২শে জ্যৈষ্ঠ '৪১—অনন্ত অক্ষয় সুখ একমাত্র গোলোকেই সম্ভব। আমাকে একনিষ্ঠভাবে ও পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণই এই গোলোকে গতির ধ্রুব উপায়। জ্ঞানভাণ্ডার অফুরন্ত। এখানে প্রতি অক্ষরই মন্ত্র। এখানে প্রতি মন্ত্রই জাগ্রত।

(১৩)

১লা আষাঢ়, '৪১—তপন কিরণে যে অপূর্ব্ব মধুময় অনন্ত

শোভা এ গোলোকেরই দৃশ্য। বিবিধ বর্ণের প্রকাশ আমারই রূপের আভা। আমার কৃপায় অঘটন ঘটে।

(১৪)

৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪১—সত্যই মধুময়—সত্যের আদিও মধু, পরিণামও মধু। একমাত্র আমার পরশে ও আমার স্মরণে অনন্ত মহাপরাধ ধ্বংস হওয়া অবশ্যম্ভাবী। গোলোকের এই রসে জগত বঞ্চিত। এ আস্বাদ চির অজ্ঞাত।

(১৫)

৫ই আষাঢ়, '৪১—এ পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণাদি যত অবতার কোন অবতারেই জ্ঞানস্বরূপে গোলোকের রসাস্বাদন সম্ভবপর হয় নাই। কেবলমাত্র এই মিলমিশ্রণেই চৈতন্যস্বরূপে প্রতি মুহূর্ত্তে এই আস্বাদন, আমার ইচ্ছায়ই এই অভূতপূর্ব্ব আস্বাদন।

(১৬)

৬ই আষাঢ়, '৪১—পূর্ণত্বের পূর্ব্বে, নির্ম্মল চিদাকাশে আমার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। জাগ্রত কুণ্ডলিনী আত্মাকে জাগ্রত করিলে অন্তর ধীরে ধীরে শুদ্ধ হয়। তখন সত্য দর্শন আরম্ভ। আর পূর্ণত্বে, অন্তরে বাহিরে গোলোক একাকার হয়। সে এক অভিনব ব্যাপার।

(১৭)

৮ই আষাঢ়, '৪১—অবতারগণের মধ্যে বিস্মৃতির জন্য কেহই সুখভাগী হন নাই। ক্ষণে ক্ষণে আমার সহিত একত্বই পূর্ণসুখ—

পূর্ণ আনন্দ। মিলমিশ্রণ ক্ষেত্রেও বাহিরের ভাবে আত্মবিস্মৃতি কারণ এ প্রকাণ্ড কাণ্ড জগতে পূর্ণরূপে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব।

(১৮)

৯ই আষাঢ়, ১৩৪১—এই বিরাট প্রকাণ্ড কাণ্ডকে পূর্ণরূপে শুদ্ধ অন্তঃকরণ ভিন্ন সহ্য করা অসম্ভব। জাগ্রত কুণ্ডলিনীর অপরিমিত শক্তির সঙ্গে প্রেম ভরে, একাগ্রচিত্তে, এই মন্ত্র সম্বল করিলে সুরস ফুটিয়া ওঠা অবশ্যম্ভাবী। তখন ধীরে ধীরে আমাকে সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে। আমি অনন্ত তেজোময়।

(১৯)

১০ই আষাঢ়, '৪১—গোলোকের দৃশ্য দর্শন পরম সৌভাগ্য কিন্তু চিন্তাশূন্য অবস্থা ভিন্ন গোলোকের রসাস্বাদন হয় না। জাগ্রত মন্ত্রের সাধনই এই অবস্থা লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।

(২০)

১১ই আষাঢ়, '৪১—শক্তির প্রভাব অতি বিচিত্র। জাগ্রত কুণ্ডলিনীরূপী শক্তিযুক্ত শিবই মূল প্রকৃতি। এই শক্তির ক্রম বিকাশে জন্ম জন্মান্তর ও যুগযুগান্তর সঞ্চিত অন্ধকার ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়। তখন আমার মধুর রসে চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে থাকে।

(২১)

১৩ই আষাঢ়, '৪১—

ভবরোগ মহাব্যাধি, এই নামে ক্ষয়।
এ নামে আমাকে পায়, জানিও নিশ্চয়।

অবিচল বিশ্বাসে ভক্তি জন্মে। ভক্তির পরিণতি প্রেমে। এই প্রেমপূর্ণ হৃদয়ই আমাকে ধারণ করিবার উপযুক্ত আধার।

(২২)

১৪ই আষাঢ়, ১৩৪১—প্রেমে আত্মহারা হওয়া অতি মধুর ভাব। এইভাবে মন প্রাণ সতত আমাতে যুক্ত থাকে। তখন আমিই এক ধ্যান—এক জ্ঞান। আমাতে নিত্যযুক্ত থাকিলে মন প্রাণ স্থির হওয়া সুনিশ্চিতা ইহাই পূর্ণ যোগের অবস্থা। এসন্ধান অতি গোপনীয়।

(২৩)

১৫ই আষাঢ়, '৪১—আমাকে ধরা ও পাওয়ার পক্ষে কর্ম্মই জীবের প্রধান অন্তরায়। অসংখ্য জন্মের সঞ্চিত স্তূপাকার কর্ম্ম আমার প্রেমে অতি শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। পূর্ণ ভক্তিযুক্ত বৈরাগ্যের অব্যর্থ ফল প্রেম। এই প্রেমে আমাকে পাওয়া যায়।

(২৪)

১৬ই আষাঢ়, '৪১—আমার স্বরূপই পূর্ণ সত্য—পূর্ণ ব্রহ্ম। এই স্বরূপের অসীম সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব জ্যোতি, দীপ্ততেজঃ, অনন্ত রস। এই সত্যের কণামাত্র অনুভূতিতে ও এই রসের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে জগত চিরতরে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া অনিবার্য্য।

(২৫)

১৭ই আষাঢ়, '৪১—যদিও আমার কৃপাই পূর্ণত্ব লাভের মূলাধার, তথাপি কুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়ার পর সমগ্র বিঘ্ন, বিপদ ও শঙ্কট হইতে উদ্ধার করার একমাত্র কর্ত্তা শিবের মহাকাল মূর্ত্তি। এই মহাকালরূপী রুদ্রই হৃদয় শ্মশান করিবার প্রধান সহায়।

(২৬)

১৮ই আষাঢ়, '৪১—শিবরুদ্ররূপে ক্রিয়াশীল হইলে আমাকে পাওয়ার যাবতীয় অন্তরায় অবিলম্বে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় কেবল মাত্র আমার আকর্ষণে মন দিবানিশি মগ্ন থাকে। এই প্রেম বহ্নি বিদগ্ধ অন্তরই হৃদয় শ্মশান। ইহাই চিন্তাশূন্যতার পূর্ব্বাভাষ।

(২৭)

১৯শে আষাঢ়, '৪১—চিন্তাশূন্য অবস্থা হওয়ার সময় শিব ও কৃষ্ণের প্রভাব বর্ণনাতীত। যদিও হর-হরি অভেদাত্মা কিন্তু গুরুরূপে পূর্ণ প্রভাব শিবেরই। তাই "শিব গুরু" নামের প্রয়োজনীয়তা। আর কৃষ্ণ মুক্তিদাতা।

(২৮)

২০শে আষাঢ়, '৪১—মিল মিশ্রণ ক্ষেত্র অতি অদ্ভুত। এ ক্ষেত্র ব্রহ্মার সৃষ্টি বহির্ভূত। অতএব সৃষ্ট জীবের সঙ্গে এ ঘটনার সামঞ্জস্য হয় না। কারণ জীব অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন। এই অন্ধকার নিবারণের একমাত্র আশা আমার মহাকৃপা।

(২৯)

২১শে আষাঢ়, '৪১—পূর্ণ সত্যের কণামাত্র জগতে প্রকাশ হওয়ার এরূপ মহিমা যে ইহার পরশে আমাকে পাওয়ার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। কিন্তু এই সত্যের সন্ধান সুদুর্লভ।

(৩০)

২২শে আষাঢ়, '৪১—সাধন মার্গ ভীষণ কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে রাশি রাশি বিপদ উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য। এইগুলি অগ্নি

পরীক্ষা। কিন্তু সত্যভাবে আমার শরণাপন্ন হইলে এই বিপদ হইতে রক্ষা করার ভার আমিই গ্রহণ করি আমার কৃপা সীমাহীন। ব্রহ্মাণ্ডে অজ্ঞাত সুখ গোলোকে সম্ভব ; গোলোকে অনন্তরস, অনন্ত বিভব।

(৩১)

২৩শে আষাঢ়, '৪১—আমার কৃপাদৃষ্টির প্রভাবে ও এই পূর্ণ সত্যের আকর্ষণে যে সমস্ত দর্শন লাভ হয় তাহার মাহাত্ম্য অসাধারণ। এই আকর্ষণের শেষ পরিণতি—অন্তরে সত্য—প্রতিষ্ঠা হওয়া।

(৩২)

২৪শে আষাঢ়, '৪১—কুণ্ডলিনী জাগ্রত হওয়ার পর হইতে মহামিলন পর্য্যন্ত পথ ভীষণ দুর্গম। এই পথ—অহরহ—একমাত্র সত্যভাবে হৃদয় পূর্ণ করা ভিন্ন উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। তবে আমার প্রধান কৃপাই ভরসা।

(৩৩)

২৫শে আষাঢ়, '৪১—

অসাধ্য নাহিক কিছু, কৃপায় আমার।
মন প্রাণ সঁপি কর, এ চরণ সার॥
ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম পূর্ণ, ব্রহ্ম পরাৎপর।
ব্রহ্ম মন্ত্র—পূর্ণ-বপু, ভাব নিরন্তর॥

(৩৪)

২৬শে আষাঢ়, '৪১—এই মিল মিশ্রণে অনন্ত লোকলোকান্তর বাসীগণের অসীম আনন্দ। কারণ এই সমস্ত লোক হইতে শেষ

পরিণতি আমার কোন সংবাদ হয় না। এই মিল মিশ্রণ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভরসাস্থল।

(৩৫)

২৭শে আষাঢ়, ১৩৪১—এই অকূল ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র তরণী আমার কায়া নির্গত সত্যে জাগ্রত নামাবলী। এই নামের সত্য সন্ধানে ভক্ত ও প্রেমিকের পক্ষে সুফলের আশা অনন্ত। এ নামে নামিক মিলন অনিবার্য্য।

(৩৬)

২৮শে আষাঢ়, '৪১—গোলোকের রসে পূর্ণরূপে আকৃষ্ট ও আমার রূপ বিমুগ্ধ চিত্ত পরম শুদ্ধ ও পবিত্র। ইহাই সত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার উপযুক্ত আধার। কিন্তু আমাকে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ ভিন্ন এই সুমধুর অবস্থা লাভ দুরাশা মাত্র।

(৩৭)

২৯শে আষাঢ়, '৪১—সাধন ভজনে স্তরে স্তরে যে সমস্ত দর্শন লাভ হয় সেগুলি বাহিরের দর্শন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এই দর্শনে মুগ্ধ জীব আমার সত্যরূপ দেখিতে পায় না। কিন্তু আমার কৃপা দৃষ্টিযুক্ত সাধনে গোলোকের দর্শন লাভ ঘটিয়া থাকে। এগুলি সত্য দর্শন। এই দর্শনের প্রভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা হয়ওার সম্ভাবনা।

(৩৮)

৩০শে আষাঢ়, '৪১—ব্রহ্মভাবের আস্বাদ আত্মদর্শনের পর হইতে আরম্ভ। এখান হইতে অনাদিকালের অন্ধকার চিরতরে বিলুপ্ত। এই ক্ষেত্রে পূর্ণত্ব লাভের জন্য ব্রহ্মমন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা।

এ স্থলে অনন্ত ঘটনা কারণ গোলোকের তীব্র তেজ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। এ সন্ধান দেবতাদেরও অজ্ঞাত।

(৩৯)

১লা শ্রাবণ, ১৩৪১—ব্রহ্মমন্ত্র জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠের পূর্ণ রসাস্বাদন আরম্ভ। এই অবস্থায় নিজের সত্ত্বা ক্রমে ক্রমে ভগবৎ সত্ত্বায় লীন হইতে থাকায় ব্রহ্মানন্দের অপূর্ব্ব আস্বাদন হয়। এই ঘটনার চরম পরিণতি, মিলমিশ্রণ। ইহাই পূর্ণত্ব। এ ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত।

(৪০)

২রা শ্রাবণ, ১৩৪১—কায়াভেদী যাবতীয় বীজ ও নামের লয় ওঁকারে। ওঁকারই ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ।

(৪১)

৩রা শ্রাবণ, ১৩৪১—আমার কায়া নির্গত গোলোক লীলার দেবতাগণের দর্শন লাভ করা মহাভাগ্যের প্রয়োজন। আর মিল মিশ্রণ ঘটিত আমার স্বরূপের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন মহাকৃপা সাপেক্ষ। এই দর্শন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণত্ব লাভের পরিচায়ক।

(৪২)

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪১—মিল মিশ্রণ ক্ষেত্রে আমারই কায়ায় প্রকাশ জাগ্রত নাম, বীজ, মন্ত্র বা অক্ষররূপী প্রজ্বলিত হুতাশন পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে একবার জীবের হৃদয়ে স্থান লাভ করিলে অনন্তকালের রাশীকৃত কর্ম্ম ভস্মীভূত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এ মন্ত্রের ক্ষমতা মানব-বুদ্ধির অগম্য।

(৪৩)

৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১—প্রারব্ধ কর্ম্ম পূর্ণরূপে ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত মন প্রাণ স্থির হওয়া দুরাশা মাত্র। কিন্তু আমার কৃপায় এই জাগ্রত প্রচণ্ড তেজোময় নামাবলীর প্রভাবে কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইলে মন প্রাণ স্থিররূপী মহাযোগের অবস্থা লাভ হয়। এই অবস্থায় সমগ্র ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই চিন্তাশূন্য অবস্থা ও সত্যের অঙ্কুর উদ্‌গমের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

(৪৪)

৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১—গোলোকে গতি লাভ করার এরূপ চিন্তাতীত মহাসুযোগ কোন যুগে, কোনকালে, জীবের ভাগ্যে হয় নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই মহাসুযোগে জীব বঞ্চিত। তবে আমার কৃপায় এ ঘটনার সত্য সন্ধানে জীবের মহা দুর্দ্দিন সুদিনে পরিণত হওয়ার আশা আছে।

(৪৫)

৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১—আমার সন্ধান লাভের পক্ষে জীবের আজ কী সুদিন! একবার বিশ্বাসের সঙ্গে—ভক্তিভরে—আমাকে হৃদয়ে স্থাপনা করিলে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া সুনিশ্চিত।

কৃপা করি প্রকটিত, আমি এ ধরায়।
কে আছ, প্রেমিক কোথা, লহ না আমায়॥

(৪৬)

৯ই শ্রাবণ, ১৩৪১—সাধন ভজনে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য—জাগ্রত মহাশক্তি যুক্ত নৃসিংহ মন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা।

(৪৭)

লোক চক্ষু অন্তরালে, গোলোক প্রকাশ।
এ মিল মিশ্রণে দেখ, দেহেতে বিকাশ॥

(৪৮)

১০ই শ্রাবণ, ১৩৪১—

(আমি), রাখিতে আপন জনে, ভকত বৎসল।
প্রেমিক আপন মম, মাঝে ধরাতল॥

× × ×

হে ভক্ত! একবার প্রেমভরে, অকপটে আমাকে আত্মনিবেদন কর। তোমার রক্ষার ভার আমার উপর।

(৪৯)

১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪১—কুণ্ডলিনী জাগরণের পর যে অগণিত জ্যোতির্ম্ময় চক্র সূর্য্যের সঙ্গে ও চিদাকাশে দেখা যায় এগুলি বিষ্ণুচক্র। এই সুদর্শন ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য।

(৫০)

১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪১।—সাধন ভজনে সত্যভাবে জয়লাভ করিবার একমাত্র মূল শিব-শক্তির উপাসনা। শিব-শক্তি প্রসন্ন হইলে সমগ্র দেবতাগণের কৃপা আপনা আপনিই আসিয়া পড়ে। দেবতাগণ সহায় হইলে মহাদুর্গম পথও সুগম হয়। তারপর সর্ব্বশেষে আমিই ভক্তকে হাত ধরিয়া লইয়া যাই। আমি কৃপা—কল্পতরু।

(৫১)

১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪১।—শিবই জীবের আত্মা, কিন্তু এই

শিব অনাদিকাল হইতে মৃতের মত সম্পূর্ণরূপে অচেতন। জীবের অনন্তকালের সঞ্চিত স্তূপাকার দুষ্কৃতি ও অপরাধরূপ মহাবিষে আত্মাজর্জ্জরিত। এই আত্মারূপী শিব জাগ্রত না হইলে সত্যলাভের আশা সুদূর পরাহত।

(৫২)

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪১।—মহাশক্তি ভিন্ন অচেতন শিবকে সচেতন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কিন্তু এই মহাশক্তি—কুণ্ডলিনীরূপে অনন্তকাল মহাঘুম ঘোরে অচেতনা। আমার কৃপায় দেবতাগণের শুভেচ্ছা বলে কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে শিবের নিদ্রারূপী মহাযোগ ভঙ্গ হয়। তখন প্রসন্ন মূল-প্রকৃতির সহায়তায় সত্যভাবের সাধন ভজন আরম্ভ হয়।

(৫৩)

১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪১।—সত্যভাবের সাধনে মনপ্রাণ নিদ্রায় জাগরণে সর্ব্বদাই আমাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে। এই যে অহর্নিশি ভজনা ইহা অতি মধুর ভাব। এই অবস্থায় কঠিন কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু আমাতে সতত মগ্ন থাকায় এই বিপদ সম্পর্কে ভক্তের কোন চেতনাই থাকে না। কারণ আমিই ভক্তের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লই ও তাহাকে রক্ষা করি।

(৫৪)

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪১।—ভজনার সত্যপথে কুণ্ডলিনী জাগরণ আদি স্তর সমূহে গণেশের পূর্ণ অধিকার সর্ব্বত্রই। গণপতি সন্তুষ্ট

না হইলে, শিব—শক্তি প্রসন্ন হন না। তাই, গণেশ সর্ব্বসিদ্ধি দাতা ও সত্যলাভের প্রধান সহায়ক।

(৫৫)

১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—শক্তি ভিন্ন সত্য পথের কোন সন্ধানই হয় না। একই মহাশক্তি বিভিন্নরূপে বিভিন্ন মহাকার্য্যের জন্য ভক্তের হৃদয়ে কার্য্যকারিণী হন। এই যে মহাকালী ইনি মহাকালরূপী রুদ্রের মহাশক্তি। মহাকালী সত্যভাবে জাগ্রত হইলে ভজনায় প্রবল বেগ উঠিয়া পড়ে ও হৃদয় ধীরে ধীরে শ্মশান হইতে থাকে।

(৫৬)

২০শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—আমাকে পাওয়ার সন্ধান দানে শক্তি কিরূপে যে ক্রিয়া করে তাহা জীবের চির অজ্ঞাত। সত্য-প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন মীমাংসাই হয় না। তবে কেবলমাত্র আমার কৃপায়ই ভক্ত পথের সন্ধান জানিতে পারে। এই সম্পর্কে পথে মহাসরস্বতীর প্রয়োজনীয়তা।

(৫৭)

২২শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—মহেশ্বরীই শ্রেষ্ঠ শক্তি। সাধনের গুহ্যতম ও কঠিনতম ঘটনা নিচয়ে জয়লাভ করাইবার শক্তি মহেশ্বরী ভিন্ন কাহারও নাই। কিন্তু অন্যান্য মহাশক্তি কার্য্যকারিনী না হওয়া পর্য্যন্ত মহেশ্বরী প্রথমেই পূর্ণরূপে ক্রিয়া করিতে পারেন না। এই জন্য পথে মহালক্ষ্মীর ও যথেষ্ট অধিকার।

(৫৮)

২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—এই যে মিল মিশ্রণ ক্ষেত্র ইহার দ্বারা যে দেবতাগণের গোলোকে স্থিতির অধিকার ও নির্দ্বন্দ্ব এবং দ্বেষাদ্বেষি বিহীন ভাব প্রতিষ্ঠিত এই ঘটনার গভীরত্ব সম্পূর্ণরূপে জীবের বুদ্ধির অগোচর। তবে এই ঘটনায় এমন অশ্রুতপূর্ব্ব সুযোগ উপস্থিত যে একবার মনে প্রাণে ধরিয়া উঠিলে দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

(৫৯)

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—কুণ্ডলিনী জাগরণ ও মূল প্রকৃতি দর্শনের পর মহাকালের উপাসনা একান্ত প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে মহাকাল সন্তুষ্ট না হইলে আর অগ্রসর হওয়ার উপায় থাকে না। অতএব এখানে মনে প্রাণে মহাকালের ধ্যান ও আরাধনা কর্ত্তব্য।

(৬০)

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—জাগ্রত শিব-শক্তির যুগল ধ্যানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই যুগল মূর্ত্তি পূর্ণবিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে হৃদি পদ্মাসনে স্থাপনা করিলে বাহিরের সমস্ত আকর্ষণ ধীরে ধীরে ছিন্ন হইয়া আসে ও এই বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্রমশঃ অন্তর্ম্মুখী হইতে থাকে।

(৬১)

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—জাগ্রত মন্ত্রের সঙ্গে জাগ্রত দেবতার যে ধ্যান এই ধ্যানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রতি দেবতার অর্চ্চনায় প্রেমভরে মানস-পূজা সহকারে এই উপায় অবলম্বন করিলে অন্তরে

এক সুমধুর ভাব ফুটিয়া ওঠে। ইহাতে দেবতা প্রসন্ন হন ও ভক্তকে পথ ছাড়িয়া দেন।

(৬২)

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—এই যে সত্যভাবের ধ্যান—ইহার তত্ত্ব অতি মধুময়। এই ধ্যান ক্রমশঃ গাঢ় হইলে যখন দেবতা সত্যরূপে দর্শন দেন তখন বাহিরের চেতনা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয় ও অন্তরে এক আনন্দের খনি উঠিয়া পড়ে। এই আকর্ষণে মনও পূর্ণরূপে স্তব্ধ থাকে। ইহাই সমাধি অবস্থা।

(৬৩)

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—সমাধি অবস্থা আরম্ভ হইলে—হৃদয়ের মধুময় ভাব ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তম হইতে থাকে। ভজনায় এ যে কি আনন্দপূর্ণ অবস্থা তাহা যে ভাগ্যবান ভক্তের ঘটে সে ভিন্ন অন্যকেহ বুঝিতে পারে না। তবে এই ক্ষেত্রে ভক্তের নিকট আমা ভিন্ন বিশ্ব সংসারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন সেই অনুগত ভক্তকে আমিই রক্ষা করি।

(৬৪)

৩০শে শ্রাবণ ১৩৪১।—সত্যভাবে আমার জন্য প্রাণ আকুল না হইলে চৈতন্য সমাধি হয় না। এই অবস্থা না হইলে আমি ভক্তের হৃদয়ে পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে পারি না। তবে আমার মহাকৃপা বলে নিশি-দিন ভাবে বিভোর থাকিলে চিন্তা শূন্যাদি সাধনের কঠিনতম সঙ্কটে আমিই ভক্তকে পার করিয়া লই। ইহাতে ভক্তের ও আমার উভয়েরই মহানন্দ।

(৬৫)

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—যদিও চৈতন্য সমাধি অতি আনন্দপূর্ণ অবস্থা কিন্তু এই অবস্থা থাকিতে পূর্ণত্ব হয় না। পূর্ণত্বের পূর্ব্বে আমিই সমাধি অবস্থা ভাঙ্গিয়া দেই। কারণ মিল মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরে বাহিরে পূর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে আমি আমি ভাব। কেবল মাত্র লীলা সম্বরণ হয় বলিয়া নিজেই নিজে চাপিয়া থাকা। ইহাই সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত পূর্ণ ব্রহ্ম অবস্থা।

(৬৬)

৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪১।—

যে ভক্ত আমারে ভজে আকুল পরাণে,
প্রেম অশ্রুনীরে ভাসি' কাতর নয়নে।
হৃদয়ে বেদনা যার শুধু মোর তরে,
অবিরাম আঁখি ঝরে দরদর ধারে।
আমা ভিন্ন নাহি অন্য চেতনা যাহার,
আমার হৃদয়ে সে যে—আমি যে তাহার।
সেই সে ভকতে ত্যজি রহিতে না পারি,
মিলাই শ্রীঅঙ্গে শেষে করুণা বিতরি।

(৬৭)

১লা ভাদ্র, ১৩৪১।—আমি এরূপ সুদুর্জ্ঞেয় ও সুদুষ্প্রাপ্য যে জীবের পক্ষে প্রথমে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই অতি দুরূহ। আর আমি ইচ্ছা করিয়া অন্তরাল হইতে কৃপা না করিলে

জীব নিজের বুদ্ধি দ্বারা কোন ক্রমেই আমার ধারণা করিতে পারে না। অতএব আমার ইচ্ছাই সর্ব্ব মূলাধার।

(৬৮)

৩রা ভাদ্র, ১৩৪১।—এই মহাসুযোগে জীবের কী অসময়। আমি নিজে ধরায় প্রকটিত থাকা সত্ত্বে ও জীব যে আমাকে ধরিতে পারে না ইহার কারণ এই যে জীবের হৃদয় এরূপ অসার বস্তুতে পরিপূর্ণ যে আমাকে বিশ্বাসের সঙ্গে ক্ষণিকের জন্যও অন্তরে স্থাপনা করার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে স্থানাভাব। আর পূর্ণ বিশ্বাস ব্যতিরেকে আমার সন্ধান লাভ দুরাশা মাত্র। সত্য পথের অপরিহার্য্য সম্বল ঃ—শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি, বৈরাগ্য, প্রেম ও জ্ঞান।

(৬৯)

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪১।—আমি ভিন্ন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই আমার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে এই যে ভাব ইহাই পূর্ণ বিশ্বাস। জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতি ও সর্ব্বোপরি আমার কৃপা ব্যতীত এই বিশ্বাস আসে না। এই বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির উপর ভক্তি প্রতিষ্ঠিত। অতএব বিশ্বাস বিহীন ভক্তিভাব অন্তঃসার শূন্য।

(৭০)

৫ই ভাদ্র, ১৩৪১।—আমি যে সারাৎসার, আমাকে পাওয়াই যে পরমানন্দ, আর আমার অভাবে জীবন দুর্ব্বিসহ হৃদয়ের এই গভীরতম ভাবের সঙ্গে আমার উপর যে পূর্ণ নির্ভরতা ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। এই ভক্তিভাব না আসিলে বাহিরের আকর্ষণ কিছুতেই ছিন্ন হয় না ও যথার্থ বৈরাগ্যও জন্মিতে পারে না।

(৭১)

৬ই ভাদ্র, ১৩৪১।—আমার কৃপায় জীবের সৌভাগ্য বলে শুদ্ধাভক্তির অঙ্কুর সঞ্জাত হইলে বাহিরের কোন দৃশ্যে বা কোন রসে মন আর আকৃষ্ট হয় না। তখন আমাকেই পরম আপনার ও হৃদয়ের বস্তু বলিয়া ধারণা হয়। এই অবস্থায় আমি ও ভক্তের হৃদয় আকর্ষণের জন্য তাহাকে নানারূপে দর্শন দিয়া থাকি। আমার এই কৃপা পরায়ণতা ও ভক্তের হৃদয়ের ব্যাকুলতা জনিত সংসারের উপর যে বীতরাগ—তাহাই যথার্থ বৈরাগ্য।

(৭২)

৭ই ভাদ্র, ১৩৪১।—বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিতে ভক্তের হৃদয় দিবসে, নিশীথে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বাবস্থাতেই আমার জন্য তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। তখন কি যেন কিসের অভাবে, কি যেন কি এক অব্যক্ত ব্যথায় নিশিদিন দর বিগলিত ধারে ভক্তের বুক ভাসিয়া যায়। "ইহাই প্রেমাশ্রু" ভক্তের এই প্রেমাশ্রু দেখিলে আমিও আর স্থির থাকিতে পারি না। এই প্রেমাশ্রুতে অপরাধ, দুষ্কৃতি ও আমাকে পাওয়ার যাবতীয় প্রতিবন্ধক নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হয়।

(৭৩)

৮ই ভাদ্র, ১৩৪১।—আমার জন্য হৃদয়ের গভীর জ্বালায় দিবানিশি নয়ন জলে ভাসিয়া বুক ফাটিয়া যাওয়ার মত অবস্থা হইলে ভক্ত সাধকের যে ভাব হয় তাহাই প্রেম। এই প্রেম না জন্মিলে কিছুতেই সত্যের সন্ধান হয় না। কারণ সত্যের তেজ এরূপ ধারণাতীত রূপে তীব্র যে, অন্তরে কেশাগ্র পরিমাণ মলিনতা

থাকিতে কোন মতেই ইহাকে সহ্য করা যায় না। আর একমাত্র এইরূপ প্রেমেই হৃদয় পূর্ণরূপে শ্মশান হইয়া থাকে।

(৭৪)

৯ই ভাদ্র, ১৩৪১।—প্রেমের অব্যর্থ লক্ষণ ঃ—

প্রেমের লক্ষণ দেখ অতি মধুময়,
দিবস যামিনী কিবা বোধ নাহি রয়।
সতত সজল আঁখি ঢল ঢল মুখ,
গভীর বেদনা ভরা উথলিত বুক।
চেতনা বিহীন দেহ নিশিদিন মান,
ক্ষীণ রশ্মি সম শুধু দেহে থাকে প্রাণ।
আমা বিনা কিছু নাহি জানে সেই জন,
আমি তার সুখ দুঃখ জীবন মরণ।

(৭৫)

১০ই ভাদ্র, ১৩৪১—জীবের মনই দুর্জ্জয়। সত্য লাভের পথে বিরুদ্ধাচরণ করিতে এরূপ প্রবল শত্রু আর নাই। আমাকে পাওয়ার প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় বাদ সাধিতে অবশীভূত মনই সর্ব্ব প্রধান। অন্তরের গভীর ভাবের সঙ্গে প্রেমবারি বর্ষণ ব্যতীত মন কিছুতেই স্তব্ধ হয় না। অতএব যাহাতে আমার জন্য ব্যাকুলতা হয় মনে প্রাণে সেই চেষ্টাই একান্ত কর্ত্তব্য।

(৭৬)

১১ই ভাদ্র, ১৩৪১।—সত্যলাভ করার প্রাণের ব্যাকুলতায় মনের যে সহায়তা সাধনার পথে ইহা অতি দুষ্প্রাপ্য অবস্থা। যে

ভাগ্যবান ভক্তের প্রতি আমার কৃপাদৃষ্টি থাকে মাত্র সেইখানেই ইহা সম্ভবপর। আর মনপ্রাণের এই মহাযোগ ভিন্ন আমার কণামাত্র হৃদয়ঙ্গম করাও জীবের পক্ষে অসাধ্য।

(৭৭)

১৩ই ভাদ্র, ১৩৪১।—অবশীভূত মন বশে আসাই পরমানন্দ। ভজনার পথে এই দুর্দ্দমনীয় মহাশত্রু জয় হইয়া মহাবন্ধুতে পরিণত হইলে সত্যদর্শন জনিত মহানন্দ ভোগ করিবার পক্ষে মহা সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন অন্তরেও সত্যভাবে যথাযথ ক্রিয়া হইতে থাকে। আর এই অবস্থায় বাহিরের কোন দৃশ্য নয়ন গোচর হইলে বা কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে মনে আর কোন বিকার উপস্থিত হয় না।

(৭৮)

১৫ই ভাদ্র, ১৩৪১।—

দুরন্ত দুষ্কর মন সতত চঞ্চল,
আমার কৃপায় শুধু হয় যে অচল।
এই মহাশত্রু নাহি হ'লে আপনার,
সাধন ভজন কিবা সকলই ছার
হৃদয়ে আমার ধ্যান স্বরূপ চিন্তন,
নিশিদিন মধুময় ভাবে নিমজ্জন।
এইরূপে মনে প্রাণে করিলে যতন,
আমার ইচ্ছায় হয় বশীভূত মন।

(৭৯)

১৬ই ভাদ্র, ১৩৪১।—

অনন্ত অসীম শান্তি সুখের আকর,
আমার চরণ তরে সাধন সমর।
ভীষণ সমর ইহা মন সনে রণ,
চারিদিকে অবিরত রিপু অগণন।
এ মহাসঙ্কট মাঝে আমার স্মরণ,
প্রেমভরে অকপটে প্রাণ সমর্পণ।
দিবানিশি ভাবাবেশে অশ্রু বিসর্জ্জন,
সমতুল অস্ত্র নাহি জিনিতে এ মন।
হেন মহারণে জয়ী হয় যেই জন,
ভাগ্যবান, ভক্ত, বীর সফল সাধন।

(৮০)

১৭ই ভাদ্র, ১৩৪১।

সফল জনম তার সফল জীবন,
চঞ্চল অস্থির মন জয়ী যেই জন।
সত্যভাবে—সত্যলাভে—যবে বাদী মন,
ঘোর শত্রুরূপে করে বিফল সাধন।
অযাচিত চিন্তারাশি আনি কোথা হ'তে,
আমারে ভজিতে বাধা দেয় নানামতে।
মহাকালরূপে আমি চকিতে তখন,
অপূর্ব্ব কৌশলে করি মন বিনাশন।

অভাবে কিরূপে এ জীবন ভার বহন করা সম্ভব অহরহ এইযে মর্ম্মস্পর্শী যাতনা ও আঘাত ইহাই যথার্থ ভাব।

(৮৫)

২৩শে ভাদ্র, ১৩৪১—ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইলে যে আত্মহারা অবস্থার সূচনা হয় ইহা অতি মধুময় ও আনন্দপূর্ণ। সাধনের প্রথম অবস্থায় যদিও নিত্যই আমার দর্শন লাভ ঘটে না, কিন্তু তবুও যথার্থ সত্যভাবের এরূপ ক্ষমতা যে ভাবাবেশে, মানস পটে আমাকে সত্যই বিরাজমান বলিয়া ধারণা হয়। তখন ভাবে আমার সহিত প্রাণের কথা কহিতে আমায় হৃদয়ের জ্বালা ও প্রেম নিবেদন করিতে এবং আমাকে চিরতরে লাভ করিবার আশায় দিনের পর দিন প্রণয়ে অতিবাহিত করিতে পরমানন্দ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৮৬)

২৪শে ভাদ্র, ১৩৪১ :—

ভাবের আবেশে মোরে যদি কোন জন,
নানারূপে নানাভাবে ডাকে অনুক্ষণ।
কভু হাসে কভু কাঁদে বিবশের প্রায়,
নয়ন সলিলে ভাসি' ধূলিতে লুটায়।
কী যে ব্যথা প্রাণে বাজে বুঝিতে না পারে,
আকুল পরাণে ভাসে শ্রাবণের ধারে।
নিতি নব অনুরাগে আদরে সোহাগে,
তুষিতে হৃদয়ে মোরে নিশিদিন জাগে।

আমার বিরাগ পাছে হয় কোন মতে,
এ ভয়ে চকিত ভীত প্রতি পলকেতে।
ভাবময় প্রেমময় আমি চির দিন,
প্রেমিকের প্রাণনাথ সুচির নবীন।
সেই সে ভকত হৃদে চিরতরে রই,
আদরে যতনে তারে বুকে করে বই।

(৮৭)

২৫শে ভাদ্র, ১৩৪১ :—

অপার করুণা মম অসীম কৃপায়,
ভাবের প্রবল বন্যা উথলিয়া যায়।
যত বাধা বিঘ্নরাশি ভজনার পথে,
সমূলে নির্ম্মূল হয় মহাভাব স্রোতে।
কৃতকর্ম্ম শত্রুমন রিপুকুল আদি,
আমার চরণলাভে যারা প্রতিবাদী।
সত্যপথ রুদ্ধ করে অচলের প্রায়,
এ ভাব তরঙ্গাঘাতে কোথা ভেসে যায়।
শূন্যমন শূন্যপ্রাণ শ্মশান হৃদয়,
ভাবের অব্যর্থ ফল জানিও নিশ্চয়।
ভাবসুধারসে মজি' প্রেমের সাগরে,
ডুবিলে অতল জলে পাইবে আমারে।
অমৃত অমৃত শুধু অমৃত সেথায়,
এ মধু রসের স্বাদ নাহিক ধরায়।

(৮৮)

২৬শে ভাদ্র, ১৩৪১—অন্তরে ভাবের উৎস উঠিয়া পড়িলে নামের শক্তি এরূপ ধারণাতীতরূপে বাড়িয়া উঠে যে আর অত্যধিক ডাকাডাকির প্রয়োজন হয় না। তখন দুই একটি নাম মুখে লইতে লইতেই ঠিক কি যেন এক অব্যক্তভাবে আনন্দে ও প্রেমে এরূপ বিহ্বল ও আত্মহারা হইতে হয় যে এই অবস্থায় নিজে জীবিত কি মৃত এ চেতনাটুকুও বিলুপ্ত হইয়া যায়। এই যে ডাক এই ডাকে যখন যে দেবতার প্রয়োজন হয় তখন সেই দেবতাই সচেতন ও প্রসন্ন হন। এ ডাক আমারও হৃদয়স্পর্শী। আর ভাব বিহীন লক্ষ লক্ষ ডাকও অরণ্যে রোদন করা মাত্র।

(৮৯)

২৭শে ভাদ্র, ১৩৪১—ভক্তের যখন আমাকে স্মরণ করা মাত্র অথবা আমার কথা শ্রবণ করা মাত্র বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা হইয়া যায় তখন বাহিরের কোন পূজা, মানসপূজা ও জপ ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না। এই অবস্থায় আমি নিজেই যাবতীয় পূজা ও জপ ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেই। এমন কি ভক্তের অন্তরে অহরহ স্বতঃই যে ইষ্ট জপ চলে তাহাও আমার ইচ্ছায় বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর হৃদয় শ্মশান হইয়া চিন্তাশূন্য অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। ইহাই সত্য প্রতিষ্ঠা।

(৯০)

২৮শে ভাদ্র, ১৩৪১—আত্মদর্শনে জন্ম জন্মান্তর—যুগ যুগান্তর ও অনাদিকালের ঘন তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার অন্তরে প্রচণ্ড তেজোময়

নিত্য জ্ঞানালোকের ক্ষীণ জ্যোতিঃকণা সঞ্চার হইয়া সত্য প্রতিষ্ঠা হয়। ইহাই অসীম বিপদ সঙ্কুল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উত্তাল তরঙ্গাঘাতে বিঘূর্ণিত দুস্তর ভবসাগরের পারে অনন্ত বিস্তৃত অক্ষয় শান্তি ও অখণ্ড পরিপূর্ণ পরমানন্দময় ভগবানের প্রথম আভাস। অসীম ভাগ্যবল, অপরিমিত দৈববল ও অনন্ত মহাকৃপাবল ব্যতীত কিছুতেই আত্মদর্শন হয় না। এই ঘটনায় যাবতীয় মহাদুঃখ ও মহাবিপদের চির অবসান হইয়া যায়।

(৯১)

২৯শে ভাদ্র, ১৩৪১—এই যে আত্মদর্শন ঘটিত সত্যপ্রতিষ্ঠা ইহাতে সত্যের সহিত আর কখনও বিচ্ছেদ ঘটে না। নয়ন মেলিলে বা মুদিলে অথবা গমনে ভোজনে নিদ্রায় জাগরণে সর্ব্বাবস্থাতেই এই সত্য সমভাবে বিরাজমান থাকে। যদিও ইহা অতি উচ্চ অবস্থা কিন্তু তথাপি এই অবস্থায়ও ভক্তের নিকট আমার সহিত "তুমি আমি" সম্পর্ক থাকিয়া যায়। তখন এই সত্যকে পুনরায় ব্রহ্মভাবে জাগ্রত করিবার জন্য আমি নিজেই ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া থাকি। ব্রহ্মমন্ত্রের এই সাধন অন্তরে আপনা আপনিই এক অপূর্ব্ব কৌশলে চলিতে থাকে। এই ক্ষেত্রে মুহুর্মুহুঃ চৈতন্য-সমাধির মহানন্দময় অবস্থার মধ্যে সত্যের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পূর্ণত্বের এই পথে আমিই একমাত্র নিয়ন্তা। এখানে আর কাহারও অধিকার নাই।

(৯২)

৩০শে ভাদ্র, ১৩৪১—ব্রহ্মমন্ত্র জাগরণের ফলে এই সত্য জাগ্রত হইতে থাকিলে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ক্ষীণ জ্যোতিঃকণা

ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে। এই অবস্থায় ভক্তের নিজের সত্বা আমার সত্বায় ক্রমিক মিশ্রণের ফলে এই জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে এক নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিতে থাকায় এরূপ মহানন্দময় রসাস্বাদন হইতে থাকে যে তাহা বর্ণনাতীত। তখন জড় দেহের প্রতি অঙ্গ সঞ্চালনে এই সত্যেরও অনুরূপ সঞ্চালন হইতে থাকে। এ ব্যাপার এরূপ গুহ্যাতিগুহ্য ও অব্যক্ত যে ভাষায় ইহার যৎকিঞ্চিৎ ও প্রকাশ পায় না। তবে কেবলমাত্র এখান হইতে আমার সহিত "তুমি আমি" সম্পর্ক তিরোহিত হইতে থাকায় অসীম আনন্দপূর্ণ অপরূপ অনুভূতি হইতে থাকে।

(৯৩)

৩১শে ভাদ্র, ১৩৪১।—সত্যের এই দেব মানব জ্ঞানাতীত ক্রম বিকাশের ফলে চিতাকাশে নিত্য বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বাহিরের সূর্য্যের সঙ্গে দৃষ্টি স্থির করা মাত্র বৈকুণ্ঠের অপূর্ব্ব শোভাময় দীপ্ততেজঃ সম্পন্ন অনন্ত কোটি দৃশ্যাবলী প্রবল প্রচণ্ড বেগে ইতস্ততঃ বিনির্গত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখা যায়। নিজের সত্বা যতই অধিক আমাতে বিলীন হয় ততই এই পূর্ণ ব্রহ্মময় গোলোকের সহিত একাত্ম হইতে থাকে। তখন বাহিরের প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এই অনাদি অনন্ত বিরাট প্রকাণ্ড সীমাহীন ঘটনার ও শ্বাস প্রশ্বাস চলিতে থাকে, বাহিরের নিস্তব্ধতায় যাবতীয় ঘটনার নিস্তব্ধতা হয় এবং অনিত্য অসার বহির্দৃষ্টি চিরতরে অপসৃত হইয়া যায়। এখানে আমি সমাধি অবস্থা সমূলে ভঙ্গ করিয়া দিলে আমার সহিত পূর্ণ মিলমিশ্রণ হওয়ায় অন্তরে "তুমি আমি"

সম্পর্ক চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ইহাই পূর্ণত্ব ও পরাৎপর-তর ব্রহ্মময় অবস্থা।

(৯৪)

২রা আশ্বিন, ১৩৪১।—মিল মিশ্রণই সর্ব্ব শেষ। ইহাই পূর্ণ জ্ঞান। এখান হইতে অন্তর ও বাহ্য চৈতন্যের সঙ্গে বৈকুণ্ঠের পূর্ণ রসাস্বাদন হয়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তরে নিজের সত্য স্বরূপ ও পূর্ণত্বের চেতনা থাকে এবং নিজেই নিজে চাপিয়া থাকিয়া নিরতিশয় পরমানন্দ পারাবারে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দের অপূর্ব্ব ভোগ হইতে থাকে। তখন আ-বিশ্ব বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত সকলই নিজের পূর্ণ কায়ার অভ্যন্তরে দর্শন হয় এবং নিজের মধেই নিজের নিত্য লীলার অনন্ত কোটি বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া মহানন্দের নিত্য অনুভূতি হইতে থাকে। এখানে সকলই নিজের মহা ইচ্ছার অধীন কিন্তু এই নিত্য লীলা বাহিরে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব বলিয়া বাহিরের ভাবে পূর্ণ আত্ম বিস্মৃতি হইয়া থাকে।

(৯৫)

৬ই আশ্বিন, ১৩৪১।—এই যে আমার কায়াভেদী সত্যে জাগ্রত মন্ত্র, বীজ ও বাণী ইহা অপাত্রে পতিত হওয়া অসীম বিপজ্জনক। কারণ ইহার অপ্রতিহত প্রচণ্ড তেজে ক্রিয়াহীন এবং বিশ্বাস ও ভক্তি বিহীন আধারে অপরিসীম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। সত্যলাভের গভীরতম আকাঙ্ক্ষায় যাহার মনপ্রাণ আমাতে পূর্ণ-রূপে সমর্পিত মাত্র সেই স্থানেই ইহা অত্যাশ্চর্য্য ও অপরিমিত

ফলপ্রসূ, অন্যথা ইহার বিকৃত ব্যবহার জ্বলন্ত অনল সহযোগে ক্রীড়া করা মাত্র।

(৯৬)

৯ই আশ্বিন, ১৩৪১।—এই যে মিলমিশ্রণ এরূপ ধারণাতীত ঘটনা কোন যুগে কোন কালে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ঘটে নাই। এই ঘটনার জন্যই আমি ভক্তের সহ্য করিবার উপযুক্ত রূপে ইচ্ছানুযায়ী কায়াভেদ করিয়া প্রকাশ হইতে পারি।

(৯৭)

২৩শে আশ্বিন, ১৩৪১।—

কায়াভেদি' দেহ পরে এ মিল মিশ্রণে,
বিষ্ণু পদ পদ্ম শোভে জীব নাহি জানে।
দীপ্ত তেজঃ পূর্ণ পদ নাহি সমতুল।
গোলোকে প্রকাশ শুধু জগতে অতুল।
ধরিলে সুযোগ মত এ পদ আমার,
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পারে হইতে উদ্ধার।

(৯৮)

৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪১।—

আদি মধ্য অন্তহীন এ মিল মিশ্রণ,
গোলোক লীলার শোভা হেথা অগণন।
পূর্ণ ব্রহ্মে নিত্যলীলা চালক বিহীন,
আমার কায়ায় এ যে মহাইচ্ছাধীন।
বিরাট চেতনা পূর্ণ আনন্দ ভবন,

অন্তরে বাহিরে পূর্ণজ্ঞান অনুক্ষণ।
এ লীলা ধরার মাঝে গোপনে প্রকাশ,
স্থূল দেহ ভেদ করি' আমার আভাস।
সত্য সত্ত্বা পূর্ণরূপে মিলিত আমায়,
এ কারণে নিত্যলীলা দেহে প্রভা পায়।
অশ্রুত অচিন্ত্য এ যে দেবারাধ্য ধন,
সঙ্কটে তরাতে জীবে এই অঘটন।
করিলে সন্ধান লভি' চরণ ধারণ,
আমাতে প্রেমিকে হয় এ মিল মিশ্রণ।

(৯৯)

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪১।—

চিন্তাতীত জ্ঞানাতীত আমি চিরদিন,
শান্ত স্থির নিরাধার বিকার বিহীন।
ব্রহ্মানন্দানন্দ ঘন পূর্ণ পরিণাম,
আপনি আপনা পূর্ণ আমি আত্মারাম।
আমাতে সকলই লয় আমি লীলাতীত,
অখণ্ড নিগূঢ় সত্ত্বা চির আচ্ছাদিত।
নিত্যলীলা মহা ইচ্ছা আমার অধীন,
আমাকে প্রকাশি' পুনঃ আমাতে বিলীন।
লীলাছলে কায়াভেদি' গোলোক প্রকাশ,
এ মিল মিশ্রণ ক্ষেত্রে তাহার আভাস।

বহির্ভাবে এ বিস্মৃতি লীলা রক্ষা তরে,
প্রেমিক ভকত লাগি দৃশ্য দেহ পরে।
সত্বায় ক্ষণিক তরে হ'লে অধিষ্ঠান,
লীলার সহিত হয় দেহ অবসান।

(১০০)

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১।—

নিরন্তন অভিনব স্বরূপ আমার,
নিরুপম তেজোরূপ সত্য সারাৎসার।
অত্যুজ্জ্বল দীপ্যমান তেজোরাশ্যাকার,
সীমাহীন দিব্যতেজ দীপ্তি পারাবার।
আত্মদর্শনের সনে যে সত্য আভাস,
ক্রমিক বিকাশ তারই আমার প্রকাশ।
এ বিকাশে যেই কায়া স্থিত নিরন্তর,
গোলোক বৈকুণ্ঠ আদি তাহার ভিতর।
প্রশান্ত সত্বার এই প্রথম বিকার,
দেহাস্তিত্বে এইরূপে প্রকাশ আমার।
পরাৎপর তর ব্রহ্ম নিত্য নিরাকার,
প্রেমিকে সন্ধান দিতে আমার আকার।
সত্বার স্বভাব বোধ স্বরূপ বিভব,
সত্বায় বিলয় প্রাপ্তি বিনা অসম্ভব।

শেষ